ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের

'পি এইচ.ডি.' উপাধির জন্য

প্রদেয় গবেষণাভিসন্দর্ভ

মাধুরী ঘোষ

নিবন্ধন সংখ্যা – A00SA0100416
বর্ষ – 2016 – 2017

তত্ত্বাবধায়িকা - প্রফেসর ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়

ইউ. জি. সি. এমেরিটাস-ফেলো (২০১৭ – ২০১৯)

ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২১

“Bhāratavarṣa O Bāṃlādeśera Svādhīnatā Saṃgrāma Āśrayī Nirvācita Saṃskṛta Nātaka; Ekati Samīkṣā”

A Thesis Submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in Partial Fulfilment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in

SANSKRIT

by

Madhuri Ghosh

Registration No.: A00SA0100416
Session: 2016 – 2017

Under the Supervision of

Prof. (Dr.) Rita Chattopadhyay

Emeritus Fellow of U.G.C. (2017 – 2019)

&

Retired Professor

Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata – 700032

2021

Certificate

Certified that the thesis entitled "ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা" (**Bhāratavarṣa O Bāṃlādeśera Svādhīnatā Saṃgrāma Āśrayī Nirvācita Saṃskṛta Nātaka; Ekati Samīkṣā**), being submitted in partial fulfilment for the award of the degree of **Doctor of Philosophy** in **Sanskrit** to the faculty of Arts, **Jadavpur University**, Kolkata, embodies the results of a genuine and bona fide research work carried out by **Madhuri Ghosh** under my guidance and supervision.

The work presented here is original in all aspects and has not been submitted earlier in part or in full to any other University for any degree or diploma to the best of my knowledge.

Date: 05.12. 2021

Signature of the Supervisor

(Rita Chattopadhyay)

Prof. Dr. Rita Chattopadhyay
Ex Emeritus Fellow & Retd. Professor
Deptartment of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata 700032

Declaration

I do hereby declare that the thesis entitled "**ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা**" (**Bhāratavarṣa O Bāṃlādeśera Svādhīnatā Saṃgrāma Āśrayī Nirvācita Saṃskṛta Nātaka; Ekati Samīkṣā**), being submitted in partial fulfilment for the award of the degree of **Doctor of Philosophy** in **Sanskrit** under the guidance and supervision of **Prof. Rita Chattopadhyay**, Ex-U.G.C. Emeritus Fellow and Retired Professor of the Department of Sanskrit, Jadavpur University, Kolkata, is an original research work carried out by me, and it has not been submitted before and published elsewhere for any degree or diploma. Any help or source of information, which has been availed in this connection, is duly acknowledged.

Date: 06.12.2021

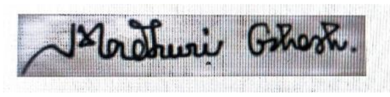

(Madhuri Ghosh)

অর্ঘ্য

আমার পরমারাধ্য বাবার চরণকমলে

ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

গবেষণার সহায়কদের মধ্যে প্রথমেই আমার পরম আরাধ্যা মাতৃসমা তত্ত্বাবধায়িকা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায়ের নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা কার্য সম্পন্ন হত না। স্নাতকোত্তর স্তর থেকেই তাঁর নিরন্তর উৎসাহ প্রদান এবং সস্নেহ সাহায্য আমাকে এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। গবেষণার বিষয়ও তিনিই নির্বাচন করে দিয়েছেন। যে তিনটি নাটকের আলোচনা এই অভিসন্দর্ভে করা হয়েছে সেই নাটকগুলিও তাঁর নিকট থেকেই সংগ্রহ করেছি। তাঁকে আমার বিনয়াবনতঃ শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই। ওনার সার্বিক সুস্থতা কামনা করি।

যাঁদের আশীর্বাদে আজ এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি, যাঁদের শিক্ষাকে পাথেয় করে জীবনে এগিয়ে চলেছি তাঁরা হলেন আমার বাবা স্বর্গীয় নিমাই ঘোষ এবং মা শ্রীমতী রীতা ঘোষ। তাঁরা আজীবন আমার সফলতা কামনা করেছেন। বাবার দৈহিক অনুপস্থিতি প্রতিমুহূর্তে মনকে ভারাক্রান্ত করে। বাবার আত্মার চির শান্তি কামনা করি। আমার মা এই গবেষণার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ক্রমাগত মনোবল যুগিয়েছেন। মাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন ভাষা আমার নেই।

যাঁর নিরলস সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই গবেষণার কাজ যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না, তিনি হলেন আমার সারস্বত অগ্রজ কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রী সৌম্যজিৎ সেন। স্নাতকোত্তর স্তর থেকে অদ্যাবধি তাঁর অমূল্য উপদেশাবলী আমাকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর বহুমূল্য সময়ের বিনিময়ে তিনি অভিসন্দর্ভের সজ্জীকরণে এবং অশুদ্ধি সংশোধনে অকৃপণ সহায়তা করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন তাঁর উত্তরোত্তর সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে আমার অকুণ্ঠ প্রণতি নিবেদন করি। এছাড়াও পি এইচ.ডি সেল ও রিসার্চ সেকশনের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব। আমার স্নাতকস্তরের শিক্ষক স্বর্গীয় শোভন চক্রবর্তীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর কাছেই প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল। ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমার ভাই সৌরভের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আর বোন সপ্তপর্ণা (ফুটু) – র জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা ও আদর। ওর শিশুসুলভ সরলতা সর্বদা চিত্তকে প্রশান্ত করেছে। ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

গবেষণার কাজে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাশে পেয়েছি তাঁরা হলেন আমার অগ্রজ অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কর, অধ্যাপক অভিজিৎ মণ্ডল, অধ্যাপিকা অনুসৃতা মণ্ডল এবং আমার বন্ধু অধ্যাপক শ্যামল পণ্ডা, দিব্যজ্যোতি মণ্ডল, রিম্পা মজুমদার ও প্রীতম দাস। এঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব। সকলের সারস্বত যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের মিঠুদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। যখনই কোন বই এর সন্ধানে গেছি, তিনি অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের গবেষক তাপস বর্মনকে। অভিসন্দর্ভের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় তিনি টাইপ করে দিয়েছেন। এই সহযোগিতার জন্য তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

যাদবপুর, কলকাতা, ২০২১

বিনয়াবনত

মাধুরী ঘোষ

সংকেতসূচি

অ. কা. সূ.	*অভিনবকাব্যালংকারসূত্রম্* (রাধাবল্লভত্রিপাঠীবিরচিতম্),সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ২০০৫।
আ. সং. সা.	*আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য* (১৯১০-২০১০) ছোটগল্প ও নাটক
ঔচিত্য.	*ঔচিত্যবিচারচর্চা* (ক্ষেমেন্দ্রবিরচিতা), (সম্পা.) ব্রজমোহন ঝা, বারাণসী, ১৯৯২ চতুর্থসংস্করণ।
কাব্যা.	*কাব্যাদর্শঃ* (দণ্ড্যাচার্যবিরচিতঃ), (সম্পা.) চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৫।
কা. প্র.	*কাব্যপ্রকাশঃ* (মম্মটাচার্যবিরচিতঃ), (সম্পা.) বামনাচার্যঝল্কিকর, নির্ণয় সাগর প্রেস, মুম্বাই, ১৯০৯।
কা. মী.	*কাব্যমীমাংসা* (রাজশেখরবিরচিতা), (সম্পা.) শ্রী নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে, চৌখম্বা প্রকাশন,বারাণসী, ২০১৪ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ)।
না. ল. রত্ন.	*নাটকলক্ষণরত্নকোশঃ* (সাগরনন্দিকৃতঃ), (সম্পা.) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৪ (বঙ্গাব্দ)।
ব. জী.	*বক্রোক্তিজীবিতম্* (কুন্তকপ্রণীতম্), (সম্পা.) সুশীলকুমার দে, ফার্মা কে. এল., কলিকাতা (অধুনা কলকাতা), ১৯৬৯ (৩য় সংস্করণ)।
বা. ম.	*বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্* (পাণ্ডুলিপি) (নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থবিরচিতম্)।
না. শা.	*নাট্যশাস্ত্রম্* (ভরতমুনিকৃতম্) (সম্পা.) আর. এস. নাগর, পরিমল পাবলিকেশ দিল্লী, ২০০৩।

সা. দ. *সাহিত্যদর্পণঃ* (বিশ্বনাথকৃতঃ), (সম্পা.) হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাসকৃত *কুসুমপ্রতিমা* টীকাযুক্ত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৫ (৫ম সংস্করণ)।

৷৷ বিষয়ানুক্রমণিকা ৷৷

বিষয়	**পৃষ্ঠা**
ধন্যবাদ জ্ঞাপন	ii
সংকেতসূচি	iv
অবতরণিকা	1
গবেষণা অভিসন্দর্ভের নির্বাচনের কারণ	2
অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য	2
গবেষণার পরিধি	3
আলোচিত গ্রন্থের পর্যালোচনা..	3
গবেষণা পদ্ধতি	5
বানানবিধি..	6
প্রথম অধ্যায় – আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য: ঐতিহাসিক নাটক এবং তার পটভূমি	7
ক. সংস্কৃত ভাষা ও আধুনিকতা	8
খ. আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য	18
গ. বিগত তিন শতকে রচিত ঐতিহাসিক নাটক এবং তার পটভূমি	28
দ্বিতীয় অধ্যায়- নির্বাচিত নাট্যকারত্রয়ের জীবনী ও সারস্বত কৃতি	39
ক. গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলে	41
খ. নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ	50
গ. রামকৃষ্ণ শর্মা	61
তৃতীয় অধ্যায়- *বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্*– একটি সমীক্ষা	70
ক. নাটকটির কথাবস্তু..	71
খ. *বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্* - ঐতিহাসিকমূল্য..	79
গ. নাটকে উপস্থাপিত চরিত্ররাজির বর্ণনা	84
ঘ. নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা	88
করুণরস সিক্ত- *বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্*..	91

অলংকার প্রয়োগ 95
ছন্দোবিচার. 100
গুণ ও রীতি সমীক্ষা. 101
চতুর্থ অধ্যায়- *ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্*- একটি সমীক্ষা 103
ক. নাটকটির কথাবস্তু. 104
খ. সাভারকারচরিত. 109
গ. নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা 116
খ্যাতবৃত্ত 116
পঞ্চসন্ধিসমন্বিত 117
সুখদুঃখসমুদ্ভূত 118
নানারসনিরন্তর. 119
অঙ্কসংখ্যা 119
নায়ক 120
রসতত্ত্ব 121
রচনাশৈলী. 122
ছন্দোবিচার 124
পঞ্চম অধ্যায়- *বাংলাদেশোদয়ম্*- একটি সমীক্ষা 127
ক. নাটকটির কথাবস্তু 128
খ. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস 139
গ. ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বাংলাদেশোদয়ম্. 141
ঘ. নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা 147
পঞ্চসন্ধি 147
ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ প্রবর্ততে 157
অলংকারের প্রয়োগ 169
গুণসমীক্ষা 179
রীতির স্বরূপ 177

ছন্দোবিচার 181
ঙ. রচনাশৈলী 183
চ. কবিসৃষ্ট অভিনবত্ব 185
উপসংহার 191
ক. ঐতিহ্য-আধুনিকতার সমন্বয় 193
খ. ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিচয় 196
পরিশিষ্ট 200
ক. কবিদের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি 200
খ. কবি প্রশস্তি 202
ঘ. বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি 205
গ্রন্থপঞ্জি 209

অবতরণিকা

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির নির্বাচনের কারণ

অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন করতে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধেয়া তত্ত্বাবধায়িকা। স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁর কাছেই প্রথম আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়ে অবগত হই। আর সেখান থেকেই এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। অভিসন্দর্ভের শিরোনামে আছে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী দু'টি নাটক। যথা – *'বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্'* ও *'ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্'* এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নাটক *'বাংলাদেশোদয়ম্'*। উক্ত নাটকগুলিও আমার তত্ত্বাবধায়িকার কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে *'বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্'* নাটকটি অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে। নাটকের প্রতি আকর্ষণ থেকেই এই বিষয়ে গবেষণায় আসা। সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব চিরপ্রচলিত। নাটকাদি দশরূপকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সর্বসমাদৃত হল 'নাটক'।

নির্বাচিত নাটকগুলির প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনেক সংস্কৃতপ্রেমীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই তো প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের অদমনীয় সব চরিত্র হয়ে উঠেছে সংস্কৃত নাটকের নায়ক/নায়িকা

গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য

- নাটকত্রয়ে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের যথাযোগ্য পর্যালোচনা।
- নাটকগুলির নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- তিনটি নাটকে প্রতিফলিত সমাজব্যবস্থার চিত্রণ।

- উক্ত নাট্যত্রয়ে প্রাচীন, অর্বাচীন, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য আলংকারিকগণের প্রভাব বিশ্লেষণ।
- নির্বাচিত রূপকত্রিতয়ে ঐতিহ্য – আধুনিকতার সমন্বয় প্রদর্শন।

গবেষণার পরিধি

এবারে আসি গবেষণার পরিধি আলোচনায়। পরিধি-ই পারে যেকোন কাজকে সুসংহত রূপ দিতে। তাই ঐতিহাসিক নাটকের বিস্তৃতি বা ব্যপকতা মাথায় রেখে আমাকে পূর্বোক্ত তিনটি নাটকের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। নাটকগুলির তাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে সংস্কৃত আলংকারিকগণের দৃষ্টিতে। প্রসঙ্গক্রমে ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনার পরিসরে অনান্য ঐতিহাসিক নাটকের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচিত গ্রন্থের পর্যালোচনা

এই গবেষণার পরিসরে বহু গ্রন্থের তথা প্রবন্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য নিয়েছি। সেই দীর্ঘ তালিকার থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উপস্থাপিত হল –

১. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ছোটগল্প ও নাটক (১৯১০-২০১০)*। কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২।

আমার গবেষণায় প্রবেশের প্রধান এবং প্রথম সহায়ক এই গ্রন্থটি। গবেষণায় আসার পূর্বে ছাত্রাবস্থা থেকেই বইটির সাহায্য নিয়েছি। ঊনবিংশ/বিংশ/একবিংশ শতকে রচিত ঐতিহাসিক, চরিতাশ্রিত, সমসাময়িক সমস্যাশ্রিত, প্রচলিত কাহিনী

অথবা কিংবদন্তীকে উপজীব্য করে রচিত – এই সমস্ত নাটককে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন গ্রন্থকার। নাট্যতত্ত্ব, ভাষা, রচনাশৈলী ইত্যাদি বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। এছাড়াও অনেক নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত গানের অপূর্ব অনুবাদ গ্রন্থটির বিশেষ আকর্ষণ। প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় সাধন করেছেন অত্যন্ত মননশীল দৃষ্টিতে। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কী – এই বিষয়ে জানার জন্য বইটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২. নাগ, নির্মলকুমার। *বাঘাযতীন: এক উপেক্ষিত নায়ক*। কলকাতা, বাঙলার মুখ, ২০১৮।

পরাধীন ভারতের মুক্তি কামনায় ব্রতী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম সতত উজ্জ্বল ছিল, আছে এবং থাকবেও। আজ এখনও তাই বিপ্লবীদের কথা আলোচনায় শিহরণ জাগে – তারই নিদর্শন এই গ্রন্থ '*বাঘাযতীন : এক উপেক্ষিত নায়ক*'। লেখক তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবীসত্তাকে বর্ণনা করেছেন। বাঘাযতীনের বংশপরিচয়, শৈশবকাল, শিক্ষা, কর্মজীবন থেকে শুরু করে তাঁর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও বালেশ্বর যুদ্ধে বীরদর্পে আত্মবলিদান –এই সমস্ত কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় অশেষ উপকৃত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান তথ্যের জন্য এই গ্রন্থটির কাছে ঋণী।

৩. ইমাম, জাহানারা। *একাত্তরের দিনগুলি* । ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬ ।

১৯৭১ এর ঢাকা শহরের অবস্থা এবং গেরিলা তৎপরতা বোঝার জন্য এই বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাঙালীদের আশা-নিরাশা-যন্ত্রণাকে সজীব

করে তুলেছে গ্রন্থটি। একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের একটি স্বচ্ছ চিত্র জাহানারা ইমাম তাঁর এই গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন।

8. Gandhi, A.K. *The Life and Times of Veer Savarkar*. Delhi, Prabhat Prakashan, 2016.

বিনায়ক দামোদর সাভারকার ওরফে বীর সাভারকারের সমগ্র জীবনচরিতকে জানার জন্য গ্রন্থটি অপরিহার্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সাভারকারের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। তিনি শুধুমাত্র একজন দেশপ্রেমিকই ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রতিভাময় কবি ও প্রাবন্ধিকও। তাঁর লেখনী দিয়ে তিনি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। বিনায়কের দীর্ঘ ৫০ বছর কারাবাস জীবনের দুর্দশার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বর্ণনা করেছেন লেখক।

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটি ‘Shonar Bangla’ ফন্টে লেখা হয়েছে, ফন্ট সাইজ ১৮। যেখানে ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে ‘Times New Roman’-এর ১৬ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। আর সংস্কৃত শ্লোকগুলির ক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সেখানে ‘Kokila’–র ১৮ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় সোনার বাংলা ফন্টের ১২.৫ এবং ইংরেজী ভাষায় Times New Roman- এর ১০ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। । দুটি পঙক্তির মাঝে ১.৫ সেন্টিমিটার ব্যবধান রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠার উপরে, নীচে এবং

ডান পাশে ১.৫ সেন্টিমিটার জায়গা এবং বামপাশে বাঁধাই এর জন্য ২ সেন্টিমিটার জায়গা ছাড়া হয়েছে। অভিসন্দর্ভের গ্রন্থপঞ্জিতে আমার তত্ত্বাবধায়িকার সমর্থিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

❖ বানানবিধি

নির্বাচিত নাটকগুলিতে কোন চরিত্র বা স্থানের নামের ক্ষেত্রে নাট্যকার যে বানান ব্যবহার করেছেন সমগ্র অভিসন্দর্ভে সেই বানানই অনুসৃত হয়েছে। আর তা হয়েছে আমার তত্ত্বাবধায়িকার নির্দেশানুসারে। যেমন '*বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্*' নাটকটিতে 'বৃটিশ' বানান এইভাবে লেখা হয়েছে। তাই নাটকটির আলোচনায় সর্বত্র নাট্যকার ব্যবহৃত বানানই রক্ষিত হয়েছে। আর বাকি জায়গায় সংসদ বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'ব্রিটিশ' লেখা হয়েছে।

।। প্রথম অধ্যায় ।।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য : ঐতিহাসিক নাটক ও তার পটভূমি

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য : ঐতিহাসিক নাটক ও তার পটভূমি

ক. সংস্কৃতভাষা ও আধুনিকতা

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কথাটি আজও যেন অনেকের কাছে অলীক কোন বস্তু। সংস্কৃতভাষা মানেই উপনিষদ্, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। আর এই ভাষার সাহিত্যিক মানেই অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস প্রমুখ। কিন্তু একথা সত্য যে, সংস্কৃত কাব্য রচনার ধারা থেমে থাকেনি। অর্থাৎ সংস্কৃত স্রোতস্বিনীর ধারা প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বিশ শতকেও এতটুকু ক্ষীণতোয়া নয়। স্বাধীনতোত্তর ভারতে এমন অনেক সংস্কৃতপ্রেমী রয়েছেন যাঁরা সংস্কৃতের প্রতি একান্ত অনুরাগে সেই ধারাকে সদা প্রবাহিত রেখেছেন। মৌলিক সাহিত্য রচনায় তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, 'আধুনিক' বলতে কী বুঝব? এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছেন –'নদী সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলেনা। যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকাটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যায় আধুনিক।'[1] সময়ের গণ্ডীতে আধুনিকতাকে বাঁধা কখনই সম্ভব নয়। কারণ ১৯৪৭– এ যেটা আধুনিক ছিল ২০২১ – এ তা আধুনিক নয়। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যা চিরকালই আধুনিক। প্রকৃতপক্ষে কোন সময় থেকে যে আধুনিকতার শুরু তা উল্লেখ করা অসম্ভব। এখানেও আমাদের দিশা দেখাই সেই কবিগুরু। তিনি

[1] *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ত্রয়োবিংশ খণ্ড), সাহিত্যের পথে-আধুনিক কাব্য, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃ. ৪২০

বললেন –'পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ধারণ করবে কে। ....এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'[2]

এবারে আসি 'আধুনিক' কথাটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে। 'অধুনা ভবঃ'- এই অর্থে অধুনা শব্দের উত্তর ঠঞ্ প্রত্যয় যোগে 'আধুনিক' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ইংরেজীতে আধুনিক বলতে Modern শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। অধুনা শব্দ থেকেই আধুনিক-আধুনিকতা-আধুনিকীকরণ প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচক Irving Howe তাঁর 'The Culture of Modernism' এই প্রবন্ধে সমকালীনতা ও আধুনিকতার পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন-

"Where the contemporary refers to time, the modern refers to sensibility and style, and where the contemporary is a term of natural reference, the modern is a term of critical placement and judgement."[3]

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সমকালীন সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। কলিদাসের বিভিন্ন নাটক, শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিকম্*, ভবভূতির *উত্তররামচরিতম্* কোনটাই এর ব্যতিক্রম নয়। আর বর্তমানে শ্রীজীবন্যায়তীর্থ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রাধবল্লভ ত্রিপাঠী প্রায় প্রত্যেকের রচনাতেই সামাজিক বার্তা উঠে এসেছে কখনও সোজাসুজিভাবে, আবার কখনও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে। এভাবে সামাজিক, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আমরা পাঠকেরা সবসময় নতুন কিছুর প্রতীক্ষা করি। নতুন কোন

[2] *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ত্রয়োবিংশ খণ্ড), সাহিত্যের পথে-আধুনিক কাব্য, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃ. ৪২০

[3] Modernism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, (Vol. III, 1971-81), p. 19

ধারা বা নতুন কোন ঘটনা আমাদের সর্বদা আকর্ষণ করে। সাহিত্যও কখনো থেমে থাকেনা। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

সাহিত্যও আধুনিকতার স্পর্শ পায়। অধ্যাপক অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র বলছেন ১৭৮৪-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ হল আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের পুনর্জাগরণকাল এবং ১৯৫০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সেই সাহিত্যের সমৃদ্ধিকাল। অর্বাচীন কালের সংস্কৃত ভাষায় গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ যেমন লেখা হয়েছে তেমনি এর পাশাপাশি এই ভাষা উদারচিত্তে গ্রহণ করেছে হাইকু, সীজো, তানকা-র মতো বৈদেশিক রচনাশৈলীকে। যাঁরা মনে করেন ইংরেজী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার দাপটে সংস্কৃত মৃতপ্রায়, তাঁদের ভ্রান্ত প্রমাণ করে এই ভাষার রচনাসম্ভার। তবে সাধারণ মানুষের মত অনেক বিদ্বানও মনে করেন সংস্কৃত ভাষা মৃত। এই প্রসঙ্গে রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর এই উক্তিটি অবশ্যই উল্লেখার্হ-

"সাহিত্যে জীবনং সর্বং সর্বাঙ্গীনং নবং নবম্
প্রতিবিম্বত্বমায়াতি সমুল্লসতি বর্ধতে।।"[4]

আধুনিকতার বিভিন্ন দিক

সাম্প্রতিক কালের কোন কোন কবিরা নির্বিবাদে প্রাচীন কাব্যপরম্পরাকে অনুসরণ করেছেন, আবার কেউ কেউ প্রচলিত ধারাকে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করে নতুন আঙ্গিকে কাব্য রচনা করে সহৃদয়বর্গের চিত্তকে রসসিক্ত করেছেন। তাঁদের রচনায় অভিনবত্ব এসেছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন -

[4] অ. কা. সূ – পরিকর শ্লোক, প্রথম অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬

ভাষাগত – বিংশ শতাব্দীতে ভাষা নিয়ে বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য সমালোচকদের মতে নাটকের পুরুষ চরিত্রেরা সর্বদা সংস্কৃতভাষী হবে, আর নারী চরিত্রদের ভাষা হবে প্রাকৃত। এই বিষয়ে দর্পণকারের মত হল-

"পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাত্ কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রয়োক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্"।।[5]

কিন্তু আধুনিক সংস্কৃত নাটকে স্ত্রী-পুরুষ উভয় চরিত্রেরই ভাষা সংস্কৃত। এছাড়াও প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন চরিত্রের মনোগত আবেগকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য কবিরা হিন্দী-বাংলা-ওড়িয়া-ইংরেজী-ফার্সি-উর্দু প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার করে থাকেন । এর পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনের বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. ' রক্ষকা এব ভক্ষকা জাতাঃ'।[6]

২. 'ইদানীং সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্রোঽসি সংবৃত্তঃ'।[7]

একইভাবে ভবালকর-বর্ণেকর-পলসুলে প্রভৃতি কবিদের রচনায় মহারাষ্ট্রীয় প্রবাদও স্থান পেয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য বা মহাকাব্যগুলি ছিল শব্দার্থালঙ্কার মণ্ডিত, নানাবিধ রসসিক্ত এবং অবশ্যই সংস্কৃত সাহিত্য রসিকদের চিত্তের আহ্লাদজনক। কিন্তু অধুনা প্রণীত কাব্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাপুরুষের চরিত্রাশ্রিত, সমসাময়িক সমস্যাশ্রিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত। এখানে পূর্ববিরচিত

---

[5] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪৬৮
[6] প্রে. স., *ধীবরশাকুন্তলম্,* পৃ. ৩০
[7] তত্রৈব, পৃ. ২৯

কাব্যগুলির মত ভাষা-সৌষ্ঠব, শব্দার্থলঙ্কারের প্রাচুর্য এবং ভাষার সরলতা সহৃদয়কে কবির মনোগত ভাবের সঙ্গে একাত্ম্য হতে সাহায্য করে।

শৈলীগত

আধুনিক সংস্কৃত রচনায় প্রায়শঃই নান্দী-ভরতবাক্য-প্রস্তাবনা-অর্থোপক্ষেপক প্রভৃতির অভাব দৃষ্ট হয়। যেমন সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের *ননাবিতাড়নম্* নাটকে নান্দীর অভাব দেখা যায়। এছাড়াও অঙ্কসংখ্যার বিষয়েও অভিনবত্ব এসেছে আধুনিক সংস্কৃত নাটকে। এবিষয়ে বলা যায় যে বর্তমানের এই প্রতিযোগিতার যুগে তাল মিলিয়ে মানুষকে সদা ব্যস্ত থাকতে হয়। মানুষের বিনোদনের অনেক মাধ্যম এসে গেছে, সময় ও ধৈর্য্য কমেছে। তাই অধুনা সংস্কৃত নাট্যকারেরা প্রায়ই একাঙ্ক নাটক রচনার পক্ষপাতী। যেমন - রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী বিরচিত *প্রেক্ষণকসপ্তকম্*। এখানে বর্ণিত প্রতিটি প্রেক্ষণকই একাঙ্কবিশিষ্ট। এছাড়াও অঙ্কের দৃশ্যবিভাগও এযুগের নাটকের একটি অন্যতম শৈলী যা নাটকের মঞ্চায়নে সাহায্যকারী ভূমিকা নেয়।

বিষয়বস্তুগত

সাহিত্য সদাই কালের দর্পণ। আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহ, বেকার সমস্যা, সন্ত্রাসবাদ, নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাজনৈতিক দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, নারী নির্যাতন, পণ প্রথা, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, মনুষ্যত্বের অবক্ষয়, মূল্যবোধের সংকট প্রভৃতি বিষয়গুলি হয়ে উঠেছে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তু। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন আশ্রয়ে রচিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের *বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্,*

অমরবীরমঙ্গলম্ ইত্যাদি, রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে আশ্রয় করে রচিত পলসুলের *সমানমস্তু বো মনঃ,* যৌতুকের সমস্যা নিয়ে শ্রীজীবন্যায়তীর্থের *বিধিবিপর্যাসম্* প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

চরিত্রগত

অর্বাচীনকালের সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাধিক অভিনবত্ব এসেছে চরিত্র চিত্রণে। আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ নাটকের নায়ক নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন -

"প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ"।।[৪]

কিন্তু সম্প্রতি সাধারণ মানুষই নাটকের নায়ক বা নায়িকারূপে স্থান পাচ্ছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গীকৃত দেশপ্রেমিক, যীশু-রামকৃষ্ণ-চৈতন্য-বিবেকানন্দ প্রভৃতি বিবিধ ধার্মিক চরিত্র, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ প্রভৃতি হয়ে উঠছেন আধুনিক সংস্কৃত নাটকের প্রধান চরিত্র। যেমন বিপ্লবী ক্ষুদিরামের জীবনকে আশ্রয় করে নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের *অমরবীরবৃত্তান্তম্* , মেবারের রানাপ্রতাপ সিং - এর অদমনীয় বীরত্ব ও দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের *মিবারপ্রতাপম্,* ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈকে আশ্রয় করে যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর *ভারতলক্ষ্মীনাটকম্* প্রভৃতি উল্লেখনীয়।

[৪] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৬৮

মঞ্চবিধিগত

নাটকের রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক জ্ঞানের জন্য আমাদের ভারতমুনির '*নাট্যশাস্ত্র'*-র উপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে রঙ্গমঞ্চ ব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আধুনিক সংস্কৃত নাটক সবসময়ই মঞ্চে অভিনীত না হয়ে কখনো রাস্তায় কখনো বা বৃক্ষতলে অনায়াসে অভিনীত হচ্ছে। বীথিনাটক, নুক্কড়নাটক প্রভৃতি এর সাক্ষ্য বহন করছে। সাম্প্রতিক কালের সংস্কৃত নাটকে এসেছে বাদল সরকারের 3rd Theatre- এর প্রভাব। মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে প্রভূত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নাটকে আমরা দেখি প্রেক্ষাগারে উপস্থিত মানুষেরা মঞ্চের উপরে এসে অভিনয় করছেন। যেমন *অথ কিম্* নাটকে মঞ্চে দর্শকের সঙ্গে নাটকীয় পাত্র পাত্রীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। এখানেও সেই বাদল সরকারের প্রভাব -

"There is no separate stage... the performance is on the floor; that is the performers and the spectators are within the same environment. [.....] This is the intimate theatre. The performers can see the spectator clearly, can approach him individually, can whisper in his ears, can even touch him if he wants."[9]

গানের প্রয়োগগত

ভরতাচার্য তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নেপথ্য সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনায় বললেন –

[9] Badal Sircar's Third Theatre: Features and Functions

"এতানি চ বহির্গীতান্যন্তর্যবনিকাগতৈঃ।

প্রয়োক্তৃভিঃ প্রযোজ্যানি তন্ত্রীভাণ্ডকৃতানি তু।।"[10]

এই সঙ্গীতই ভারতের মধ্যে ধ্রুবা গীতি। দৃশ্যকাব্য বা নাটকের একটি অন্যতম অঙ্গ হল ধ্রুবা। ভরতের মতে গানের উপস্থিতি হত নেপথ্যে। কিন্তু বর্তমান সংস্কৃত নাটকে গান নেপথ্যে নয় বরং মঞ্চে উপবিষ্ট পাত্র পাত্রীর দ্বারাই গীত হয়। নাট্যশাস্ত্রের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে ধ্রুবা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"ধ্রুবেতি সংজ্ঞিতানি স্যুর্নারদপ্রমুখৈর্দ্বিটজৈঃ

যান্যঙ্গানীহ উক্তানি তানি যে সন্নিবোধত।।

যা ঋচঃ পাণিকা গাথা সপ্তরূপাঙ্গমেব চ।

সপ্তরূপপ্রমাণং হি সা ধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতা।।"[11]

ভরত মুনি কথিত এই ধ্রুবাই বর্তমানে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকে দেখা যায়। ধ্রুবাগীতির সমস্ত প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য সর্বদা অনুসৃত না হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের *মিবারপ্রতাপম্* নাটকের গান, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের *ননাবিতাড়নম্* নাটকের গান,গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলের *ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্* নাটকের গানের কথা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে এখানে *ননাবিতাড়নম্* নাটকের গানের উল্লেখ করা হচ্ছে -

---

[10] না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১০২

[11] তত্রৈব, পৃ. ১০৩.

"শৃণু শৃণু সমাগত! সর্বগুণিজন।

অধিকারিগীতেঽধুনা দীয়তাং হি মনঃ।

নানাবৃতং সমালম্ব্য নিবেদ্যতে ময়া

সরসকটুকা কথা হীনতাললয়া

(অহো হীনতাললয়া...)

অস্তি তত্র ননানাম্নী দেবী মহীয়সী।

সর্বজনবন্দ্যা সা হি মাতা গরীয়সী।

পূরবী কন্যকা তস্যা রঙ্গদেশে জাতা।

উত্তরাপি সুতা তস্যাস্তত্র সমায়াতা

কালে তত্র সমাগতা বিদেশিনী কন্যা।...."[12]

এছাড়াও অর্বাচীন সংস্কৃত নাটকে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব দেখা যায়।

ছন্দোগত

অর্বাচীন সংস্কৃত নাটকের এক অন্যতম নতুন দিক হল ছন্দ। লৌকিক সমবৃত্ত, বিষমবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগের পাশাপাশি বৈদেশিক ছন্দের প্রয়োগও দেখা যায়। সপ্তদশ অক্ষর বিশিষ্ট তিনটি চরণাত্মক হাইকু কাব্যে প্রতিপাদে ৫-৭-৫ ক্রমে সংখ্যা থাকে।

---

[12] *ননাবিতাড়নম্*- স.সা.প.প,Vol. LVII, No. 1-3, May to July, 1974.

যথা হর্ষদেব মাধবের *ঋষেঃ ক্ষুব্ধে চেতসি* থেকে নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি দেখা যেতে পারে-

"কাঁলেজ-কন্যা

সৌন্দর্য মধুকোশঃ

রূপস্য প্রপা"[13]

পাঁচটি চরণে বিধৃত একত্রিংশাক্ষরাত্মক তানকা কাব্যের প্রতি চরণে যথাক্রমে ৫-৭-৫-৭-৭ সংখ্যা বর্তমান থাকে। এর উদাহরণও উপরি-উক্ত কাব্য থেকে দেওয়া হল—

"হরিণী হতা

ব্যাধেন নিষ্ঠুরেণ

সায়ং খাদিতা

সা পুনশ্চ শসিতি

ব্যাধবধ্বা বক্ষসি"[14]

এছাড়াও আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক নতুন ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রথিতযশা কবি বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য তাঁর রচনায় কল্লোলিনী-বেনুস্বনা-বপ্রক্রীড়া-হিন্দোলা-নীলাঞ্জনা-মদালসা-বিচিত্রা প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

[13] *ঋষেঃ ক্ষুব্ধে চেতসি*, পৃ. ৫১.

[14] তদেব

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্বিকদের প্রভাবগত

আধুনিক সংস্কৃত নাট্যকারেরা ভরত-ভামহ-আনন্দবর্ধন প্রমুখ আলংকারিকদের যতটা মান্যতা দিয়েছেন ঠিক ততটাই তাঁরা ব্রেখট্-বেকেট্-অ্যারিস্টটল-প্লেটো প্রমুখ পাশ্চাত্য কাব্যতাত্ত্বিকদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের বাদল সরকারের 3rd Theatre-এর প্রভাব পড়েছে সংস্কৃত নাটকে, ঠিক তেমনি পড়েছে ব্রেখট্-এর Alienation Effect-এর প্রভাব। এছাড়াও অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডিও আমরা দেখি বর্তমান সংস্কৃত নাটকে। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতেই পারি যে আধুনিক সংস্কৃত রচনাগুলি প্রকৃতই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খ. আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য

‘সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়ঃ।’[15]

প্রাচীন সাহিত্যসমালোচকগণ দৃশ্য-শ্রব্য ভেদে সমগ্র কবিকৃতির দুটি বিভাগ স্বীকার করেছেন। তার মধ্যে শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। মঞ্চাভিনয়ের জন্যই সহৃদয়গণ দৃশ্যকাব্যের রসোপলব্ধি অনায়াসেই করে থাকেন। তাই আলংকারিক, কবি ও নাট্যকার সকলেই প্রায় একবাক্যেই দৃশ্যকাব্যের গুণকীর্তন করেছেন।

এখানে আমাদের আলোচ্য আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য বিভিন্ন অভিপ্রায়ে বিভিন্ন নাম ধারণ করে। নাটকীয় চরিত্রগুলির অবস্থার অনুকরণ করে বলে তা

[15] *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ*, পৃ. ৩৭

‘নাট্য’, তার আর এক নাম ‘রূপক’ কারণ নট-নটীর উপর চরিত্রগুলির রূপের আরোপ হয়। আর মঞ্চে অভিনীত হওয়ার কারণে তা ‘দৃশ্যকাব্য’ নামে অভিহিত হয়। আর আমাদের এই আলোচনায় নাট্য, রূপক, দৃশ্যকাব্য সবই নাটক-এ পর্যবসিত হয়েছে। বিশশতকের সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটেছে বিভিন্ন দিক থেকে। যেমন – বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষা প্রভৃতি।

পণপ্রথা, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কুষ্ঠরোগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নকশাল আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা, ইউ. এন্. ও-র ব্যার্থতা – আরও অনেক বিষয়ালম্বনে রচিত হয়েছে এ যুগের নাটক। লেনিন, ম্যাক্সমূলার, মীরাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রাণাপ্রতাপ সিং, শিবাজী প্রমুখ চরিত্র এবং আরও অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলাদেশের অভ্যুত্থান প্রভৃতি হয়েছে নাটকের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। আর শুধু ঐতিহাসিক কেন রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থ-সামাজিক আথবা সমসাময়িক ঘটনাও সংস্কৃত সাহিত্যে আপন আপন স্থান করে নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত সমালোচিকা অধ্যাপিকা ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায় এর মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য –

“The Sanskrit scholars, like any other scholars in any field are also affected by the turmoils and vicissitudes of the pressing problems of the society.”[16]

[16] *2oth Century Sanskrit Literature: A Glimpse into Tradition & Innovation*, p. 176.

আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

যথা –

ক. ঐতিহাসিক নাটক।

খ. জীবনীমূলক নাটক।

গ. সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে রচিত নাটক।

ঘ. উপনিষদ্/রামায়ণ/মহাভারত/পুরাণাবলম্বনে বিরচিত নাটক।

ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে এই অধ্যায়েরই পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে। এখানে বাকি নাটকগুলি সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

জীবনীমূলক নাটক

"Biographical work should not be a mere history or biography i.e., an insipid statement of dates and facts nor can it be a mere 'fiction' or ' fantasy' soaring only on the wings of imagination – however, sweet or charming. Thus an author of biographical poetry – be it either in poetic or in dramatic form – has to steer between two extremes; history and imagination, cautiously but artistically."[17]

জীবনীমূলক কথাটির মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনচরিতকে আশ্রয় করেই যখন কাব্য রচনা হয়। বিশ/একুশ শতকের সংস্কৃত

[17] *2oth Century Sanskrit Literature: A Glimpse into Tradition & Innovation*, p. 114-115

নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র, মহাপুরুষের চরিত্র, ধার্মিক চরিত্র, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও বিদগ্ধজন প্রমুখ নাটকের মুখ্য চরিত্র হয়েছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য, তুকারাম প্রমুখ মহাপুরুষের জীবনীর পাশাপাশি বাঘাযতীন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের দেশপ্রেমকে অবলম্বন করেও রচিত হয়েছে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক। নিম্নে তালিকাকারে কিছু নাটকের পরিচয় দেওয়া হল –

নাট্যকার	**নাটক**	**বিষয়বস্তু**
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	*ভারতলক্ষ্মীনাটকম্*	ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর জীবন ও লড়াই – এর কাহিনী এই নাটকের মুখ্য উপজীব্য বিষয়।
রমা চৌধুরী	*নিবেদিত-নিবেদিতম্*	বারটি দৃশ্যে বিধৃত ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও পুণ্যকীর্তি অবলম্বনে রচিত।
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	*শ্রীশঙ্করাচার্য্যবৈভবম্*	শঙ্করাচার্য্যের জন্ম, শৈশবকাল ও সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশকে কেন্দ্র করে রচিত।
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	*দেশবন্ধুদেশপ্রিয়ম্*	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জীবন, কীর্তি, তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও দেশপ্রেম উপস্থাপিত হয়েছে এই নাটকে।
নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ	*বঙ্গকীর্তিবিধানম্*	প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং রাজনীতিবিদ্ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনাবলম্বনে লেখা।
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	*সিদ্ধার্থচরিতম্*	সিদ্ধার্থ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের জীবন ও দর্শনকে আশ্রয় করে রচিত।

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	*ভারতবিবেকম্*	স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাবলম্বনে লেখা নাটক।
অমিয়নাথ চক্রবর্তী	*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্*	শ্রী চৈতন্যদেবের পবিত্র জীবনকে আশ্রয় করে বিরচিত।
রমা চৌধুরী	*যুগজীবনম্*	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনকে আশ্রয় করে রচিত।
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	*ভারতরাজেন্দ্রম্*	স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদের জীবনকে কেন্দ্র করে বিরচিত নাটক।

সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে রচিত নাটক

বিশ/একুশ শতকে সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষামূলক প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যাকে কেন্দ্র করে একাধিক সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে। কিছু মানুষের বদ্ধ ধারণা যে, সংস্কৃতকাব্য মানেই তা রাজা-রাণীর জগৎ, কিন্তু সেকথা একেবারে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন এযুগের কবিরা। স্বাধীনতার আবহ, সাম্প্রদায়িক কলহ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণ প্রভৃতি বারবার ঘুরে এসেছে সংস্কৃত কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে। এখানে কিছু নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল –

মশকধানী

নাটকটির রচয়িতা রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অসীম ক্ষমতার চিত্রায়ণ আর ভোগলিপ্সু সমাজের নগ্নচিত্র-ই এই নাটকের বিষয়বস্তু। মশকধানী অর্থাৎ ‘মশারি’, আর তা বড়লোকের আরামের জায়গা। এই মশারির চারটি দণ্ড

সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যচারের এ যেন এক প্রকৃষ্ট দলিল।

গণেশপূজনম্

এটিও রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর রচনা। নাটকটির প্রেক্ষাপট হল – একটি সর্বজনীন গণেশপূজার উৎসব। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক উভয়ের বিচারেই নাটকটি অনবদ্য। গণেশপূজাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের প্রতাড়না এই সমস্ত কিছুই অসামান্য দক্ষতায় লিপিবদ্ধ করেছেন নাট্যকার।

এছাড়াও সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত চারটি নাটকেই সমকালীন বাস্তবতা নাটকীয় রূপ নিয়েছে। নাটকগুলি হল – *ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্* (১৯৭১), *অথ কিম্* (১৯৭৪), *ননাবিতাড়নম্* (১৯৭৪), *স্বর্গীয়হসনম্* (১৯৭৭)।

ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্

রাজনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা একটি ব্যঙ্গনাটিকা। নাটকটিতে রয়েছে ৯টি পুরুষ চরিত্র ও ১টি নারী চরিত্র, তিনিই হলেন নায়িকা ধরিত্রী। নাটকটির প্রেক্ষাপট একটি পান্থশালা, যার মালিক স্বয়ং ভগবান্। তাঁর সহকারী হলেন বিশ্বকর্মা। বিবাহযোগ্যা, রূপবতী কন্যা ধরিত্রীকে সকলেই বিবাহ করতে চায়। তাকে নিয়ে সকলের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি চলতে থাকে। ধরিত্রী ভগবানের মেয়ে অর্থাৎ পৃথিবী। তাকে গ্রাস করার জন্য সবাই উন্মুখ। নাট্যকার তাঁর এই নাটকের মধ্যে দিয়ে ১৯৪৫ – প্রতিষ্ঠিত U.N.O – র ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছেন।

অথ কিম্

দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ পরিবেশিত হয়েছে নাটকটির মধ্যে দিয়ে। নান্দী থেকে শুরু করে ভরতবাক্য সবকিছুতেই অভিনবত্ব। নাটকটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ক, খ, গ, ঘ ক্রমে চরিত্রগুলির নামকরণ। এখানে কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষকে মনে পড়ো যায়। যক্ষের কোন নামকরণ না করে কবি যেমন সর্বকালের বিরহীর আর্তনাদকে তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনই সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ও চরিত্রদের নামকরণ না করে দেশের আপামর জনসাধারণকে বুঝিয়েছেন। ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি, জনসাধারণের অনীহা, রাজনৈতিক দলের প্রতি মানুষের নির্ভরতার অভাব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে নাটকটিতে।

স্বর্গীয়হসনম্

রবীন্দ্রনাথের ‘স্বর্গীয়প্রহসন’ – এর অনুপ্রেরণায় নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকটির মধ্যে দিয়ে মন্ত্রী, সাংসদ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি ফুটে উঠেছে। নাট্যকার চরিত্রগুলির নামকরণ করেছেন স্বর্গের দেবতাদের নামানুসারে। যেমন – বৃহস্পতি, ইন্দ্র প্রভৃতি। নাটকটিতে নেই কোন নান্দী, আর ভরতবাক্যে জনকল্যাণকারী নেতার জয়গান করা হয়েছে।

ননাবিতাড়নম্

ননা অর্থাৎ ‘মা’ বা ‘সংস্কৃতভাষা’, তার বিতাড়ন নাটকটির বিষয়বস্তু। এখানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিদগণের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। এখানে দেখানো

হয়েছে কিভাবে সংস্কৃতের-ই তিন বিশেষজ্ঞ সংস্কৃতের বিতাড়ন নিশ্চিত করলেন। এছাড়াও আরও অনেক নাটক রয়েছে যেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়। তাই তালিকাকারে তাদের নামোল্লেখ করা হল –

নাট্যকার	**নাটক**
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	*বিবাহবিড়ম্বনম্*
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	*চিপিটকচর্বণম্*
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	*ক্ষুতক্ষেমীয়ম্*
গৌরী ধর্মপাল	*জননী*
অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র	*অভিষ্টমুপায়ম্*
হরিদত্ত শর্মা	*বধূদহনম্*
নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ	*মাতৃহননম্*
সুখময় মুখার্জী	*সংস্কৃতোদ্ধারণম্*
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	*বেষ্টনব্যায়োগঃ*
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	*শার্দূলশকটম্*

উপনিষদ্/রামায়ণ/মহাভারত/পুরাণ অবলম্বনে রচিত নাটক

প্রাচীন সংস্কৃত কবি থেকে শুরু করে আধুনিক কবি, বাংলা এবং প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভবে ও ক্রমবিকাশে উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের প্রভাব একবাক্যে স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের *কর্ণকুন্তীসংবাদ,*

‘গান্ধারীর আবেদন’, বুদ্ধদেব বসুর *‘প্রথম পার্থ’*, *‘অনাম্নী অঙ্গনা’*, মারাঠী ভাষায় শিবাজী সাবন্তের *‘মৃত্যুঞ্জয়’*, কন্নড় ভাষায় এস্. এল্. ভৈরাপ্পার *‘পর্ব’* প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণাশ্রয়ী ভাসের নাটক এবং বাংলা ভাষায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের *‘রাবণবধ’*, *‘সীতার বনবাস’* প্রভৃতি স্মরণীয়। বিশশতকের সংস্কৃত সাহিত্যও এর ব্যাতিক্রম নয়। বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আসলেও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর উপর কবিদের নির্ভরতা এতটুকুও কমেনি। নিম্নে উল্লিখিত নাটকগুলির পরিচয় থেকেই এই ধারনা সুস্পষ্ট হয়-

নাট্যকার	**নাটক**	**বিষয়বস্তু**
অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র ও পঞ্চানন রায়	*রুরু-প্রমদ্বরা*	মহাভারতের রুরু-প্রমদ্বরার কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
রামকৃষ্ণ শর্মা	*বিড়ম্বনা*	মহাভারতের ‘কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ’ অবলম্বনে বিরচিত।
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	*গিরিধর-সংবর্ধনম্*	বীররসাশ্রিত ব্যয়োগ। কৃষ্ণের গিরি গোবর্দ্ধন ধারনের কাহিনী আশ্রিত।
দূর্গাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ	*একলব্যগুরুদক্ষিণম্*	মহাভারতের আদিপর্বস্থ দ্রোণাচার্য্য ও একলব্যের কাহিনী।
নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ	*মহিষাসুরলাঞ্ছনম্*	কালিকাপুরাণের উপাখ্যান।

এইচ্. ভি. নাগরাজরাও	*বিদুলাপুত্রীয়ম্*	মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে প্রাপ্ত বিদুলার উপাখ্যান।
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	*কৈলাসনাথবিজয়ম্*	রামায়ণে বর্ণিত রাবণ কর্তৃক কৈলাস পর্বত উত্তোলনের কাহিনী।
কালিপদ তর্কাচার্য্য	*মাণবকগৌরবম্*	মহাভারতের আদিপর্বস্থ আয়াধৌম্য এবং তার কয়েকজন শিষ্য উপমন্যু, আরুণি, কাত্যায়ন প্রমুখের উপাখ্যান।
কালিপদ তর্কাচার্য্য	*স্যমন্তকোদ্ধারণম্*	ভাগবৎ পুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণ কর্তৃক স্যমন্তক মণির উদ্ধার এই নাটকের মূল বিষয়।

বিবিধ

পূর্বোক্ত নাটকগুলি ছাড়াও আরও অনেক বিষয়কে অবলম্বন করে বিশ/একুশ শতকে সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে। সেগুলিকে কোন বিশেষ শ্রেণীতে না রেখে আমরা বিবিধের তকমা দিতেই পারি। সেই রকম বিবিধ বিষয়ের আশ্রয়ে রচিত কিছু নাটকের নামের তালিকা দেওয়া হল –

নাটক	**নাট্যকার**
কলাপপ্রশস্তিঃ	অবনীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

অনুকূল-গলহস্তকম্	বিষ্ণুদ ভট্টাচার্য্য
মাধুরী-সুন্দরম্	শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
ভট্টসংকটম্	শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
দরিদ্রদুর্দৈবম্	শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

গ. বিগত তিন শতকে রচিত ঐতিহাসিক নাটকের পটভূমি

প্রাচীন যুগে ঐতিহাসিক রচনার স্বল্পতাই বাঙালীর ইতিহাসের প্রতি অনীহা প্রমাণ করে। ইতিহাস ব্যতীত ঐতিহাসিক নাটক রচনা সম্ভব নয়, এও প্রকৃত সত্য। কারণ ইতিহাস ও নাটক – এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধই ঐতিহাসিক নাটকের জন্ম দেয়। বাঙালীর অতীত ইতিহাসের অস্তিত্ব আমাদের কাছে অধরাই থেকে গেছে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মত হল–

“বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে কি? সাহেবরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শমান লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। কিন্তু এসকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। .... বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা

ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র"[18]

কিন্তু ইতিহাস কথাটি যে প্রাচীন ভারতভূমিতে একেবারে অপরিচিত ছিল তা নয়। প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে আমরা প্রথম ইতিহাস শব্দটির উল্লেখ পাই। প্রাচীনকালে মহাভারতও ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে পঠিত হত। এছাড়াও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়লেও জানা যায়, প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের ব্যাপক চর্চা ছিল। সেখানে ইতিহাসকেই বেদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া পুরাণেও রাজবংশাবলীর বিবরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এ তো গেল ইতিহাসের কথা। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক তো শুধু ইতিহাস নির্ভর তথ্য হতে পারেনা, দেখতে হয় তাতে ঐতিহাসিক তথ্যের পাশাপাশি নাটকের বৈশিষ্ট্যাবলী বজায় আছে কিনা। এই আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না এই পরিসরে।

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ

অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস চিররহস্যাকীর্ণ। এই বিষয়ে রয়েছে অসংখ্য মতভেদ, বহু অনুমান ও সিদ্ধান্ত। এগুলির মধ্যে কোনটি যে নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য তা নিশ্চিত করে আজও বলা যায় না। একথা সত্য যে নাটক না থাকলে নাট্যতাত্ত্বিক গ্রন্থের প্রসঙ্গ ওঠেনা। সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের

[18] বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ অগ্রহায়ণ।

পূর্বেই যে নাট্যসাহিত্য বিদ্যমান ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এখন নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি বিষয়ক কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ করা হল –

১. পৌরাণিক মতবাদ

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ে আমাদের প্রথম প্রণম্য মহর্ষি ভরত। তাঁর নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে যখন সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তখন মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন এমন কিছু সৃষ্টি করতে যা একইসঙ্গে হবে দর্শনযোগ্য ও শ্রবণযোগ্য। দেবগণের আবেদনে সম্মতি জানিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে সৃষ্টি করলেন নাটক –

“জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামেভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি।।”[19]

ব্রহ্মার আদেশে সশিষ্য ভরত ইন্দ্রধ্বজোৎসবে *দেবাসুরসংগ্রাম*-এর অভিনয় করেন। এর পর ব্রহ্মা *অমৃতমন্থন* ও *ত্রিপুরদাহ* নামক নাটক রনা করেন।

২. বেদভিত্তিক মতবাদ

ঋগ্বেদে প্রাপ্ত সংবাদসূক্তগুলিকে নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যথা – যম-যমীসূক্ত(১০/১০), পুরূরবা-উর্বশীসূক্ত(১০/ ৯৫), সরমা-পণিসূক্ত(১০/১০৮), বিশ্বামিত্র-নদীসূক্ত(৩/৩৩) প্রভৃতি। পণ্ডিতগণের মতে এই

[19] না. শা. সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩.

সূক্তগুলিতে যে সংলাপ রয়েছে, তাকে সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনতম রূপ বলা যেতে পারে। অধ্যাপক উইন্টারনিৎস-এর মতে –

"This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama, for these ballads consist of a narrative and a dramatic element."[20]

[20]*History of Indian Literature*, Vol – I, p. 90.

৩. পুতুলনাচভিত্তিক মতবাদ

অধ্যাপক মিশেলের মতে পুতুলনাচ অর্থাৎ puppet play থেকে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর বক্তব্য হল - 'সূত্র' ধরে পুতুল স্থাপন করতে হয় এবং তা থেকেই সংস্কৃত নাটকে 'সূত্রধার' ও 'স্থাপক' শব্দদুটির আগমন হয়েছে। পুতুলনাচে সূত্রধার যেমন পর্দার আড়াল থেকে সূত্র ধরে পুতুল নাচায়, তেমনি সংস্কৃত নাটকেও সূত্রধার পর্দার অন্তরালে থেকে সমগ্র নাট্যাভিনয়ের পরিচালনা করে থাকেন।

৪. ছায়ানাটকভিত্তিক মতবাদ

অনেক পণ্ডিতগণ ছায়ারূপককে নাটকের মূল উৎস রূপে স্বীকার করেন। এই জাতীয় রূপকে দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চের পিছনে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনীত ঘটনার পর্দায় প্রতিবিম্বিত ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ করেন। সংস্কৃতে সুভট বিরচিত *'দূতাঙ্গদ'*, ব্যাস শ্রীরামদেব রচিত *'সুভদ্রাপরিণয়'*, *'রামাভ্যুদয়'* – এই ছায়ানাট্যগুলির পরিচয় আমরা পাই। ভবভূতির '*উত্তররামচরিত*' – এর ছায়াসীতাবৃত্তান্তকেও ছায়ারূপকের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই ছায়ারূপকের প্রাচীনতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক কীথ তাই এই মতবাদটিকে খণ্ডন করে বলেছেন –

"The early evidence adduced for the existence of the shadow drama is wholly unreliable."[21]

[21] *The Sanskrit Drama*, A. B. Keith, p. 310.

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ক আরও অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে, কিন্তু সমস্ত মতবাদের নিরিখে বেদভিত্তিক মতবাদ অর্থাৎ সংবাদসূক্ত সমূহের মধ্যেই নাটকের বীজ নিহিত – এই মতবাদটিকেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটক

সংস্কৃত নাট্যশালার উৎকর্ষ বিশ্বখ্যাত। অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতি প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকারেরা এই ভাষায় তাঁদের অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। পৌরাণিক, সামাজিক এমনকি আমাদের আলোচ্য ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েও রচিত হয়েছে একাধিক সংস্কৃত নাটক। আপাতভাবে ইতিহাসের কোন বিখ্যাত ঘটনা বা চরিত্র অবলম্বনে লেখা নাটককেই ঐতিহাসিক নাটক অখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের মতে –

‘নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।’[22]

এই খ্যাতবৃত্ত কথার মধ্যে ইতিহাসেরও অন্তর্ভুক্তি হয়। অধ্যাপক কীথের গ্রন্থ থেকে আমরা নিম্নোক্ত সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটকগুলির বর্ণনা পায় –

ক. *ললিতবিগ্রহরাজ* নাটক। নাট্যকার সোমদেব।

খ. জয়সিংহসূরি বিরচিত *মদমর্দন*।

গ. বিদ্যানাথ লিখিত *প্রতাপরুদ্রকল্যাণ*।

ঘ. চোলসম্রাট রাজরাজের গুণকীর্তন সম্পর্কিত *রাজরাজনাটক*।

[22] সা. দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩

৬. গঙ্গাধর লিখিত *গঙ্গাদাসপ্রতাপবিলাস* নাটক।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদান বলতে আমরা বুঝি পুরাণের বংশানুচরিত, প্রশস্তি, প্রত্নলেখ, মুদ্রা, এবং কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থ। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিবিধ শিলালেখ যেমন – সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি, ভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তি প্রভৃতি। এছাড়াও বাণভট্টের *হর্ষচরিত*, পদ্মগুপ্তের *নবসাহসাঙ্কচরিত*, কলহণের *রাজতরঙ্গিনী* প্রভৃতি।

আর, সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটক বললেই বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* – এর নাম আমাদের স্মরণে আসে। নাটকটির ঐতিহাসিকত্ব বিচার করতে গেলে প্রথমেই আসে এর বিষয়বস্তু। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়লীলা ব্যতিরেকে সেযুগে নাটক রচনা সম্ভবপর ছিলনা। কিন্তু নাট্যকার বিশাখদত্ত সে বিষয়কে অগ্রাহ্য করে বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আর শুধুমাত্র অলঙ্কারমণ্ডিত প্রেমালাপের বর্জনই নয়, এমনকি নাটকটি সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীভূমিকা বর্জিত।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে একটি নাটককে আমরা কখন ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দেব। ঐতিহাসিক নাটক যে শুধুমাত্র ইতিহাস নয় একথা বলাই বাহুল্য। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করি, সেই উদ্দেশ্যে আমরা কখনই ঐতিহাসিক নাটক দেখি না বা পড়ি না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় –

“ইতিহাস পড়িব, না আইভ্যানহো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুই-ই পড়ো, সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যানহো পড়ো।”[23]

[23] ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাহিত্য।

নাটকের বিষয়টি ইতিহাস থেকে আহৃত হলেও ঐতিহাসিকতাতেই তার শেষ সিদ্ধি নয়। অনেক বেশি তথ্য থাকলেই যে তা উৎকৃষ্ট নাটক হবে এমন নয়, আবার খুব অল্প তথ্যের ভিত্তিতেও শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন – শেকসপীয়রের *জুলিয়াস সীজর, রিচার্ডস* প্রভৃতি। এবিষয়ে কবিগুরুর মতটি প্রণিধানযোগ্য –

" ইতিহাস যে বেদবাক্য তাহা নহে। সকলেই জানেন, একটা উপস্থিত ঘটনা স্থলেও প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে অতি অল্প লোকেই পারে। খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্ত হইতে একটি সমগ্র মানব চরিত্র ও ইতিহাস রচনা করা আরও অল্প সোকের সাধ্যায়ত্ত। সকলেই জানেন, আত্মীয় সম্বন্ধেও আত্মীয়ের ভ্রম হয় এবং বন্ধুকেও বন্ধু অনেক সময় বিপরীত ভাবে বুঝিয়া থাকেন। আসাধারণ লোককে প্রকৃতভাবে জানা আরো কঠিন; দূর হইতে এবং অতীত বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার যথার্থ প্রতিকৃতি নির্মাণ বহুল পরিমাণে কাল্পনিক, তাহার আর সন্দেহ নাই। .....ইতিহাস মাত্রই যে বহুল পরিমাণে লেখকের অনুমান ও পাঠকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে কবির অনুমান ঐতিহাসিকের অনুমান অপেক্ষা প্রকৃত ইতিহাসের অনেক কাছাকাছি যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।"[24]

[24] কৃষ্ণ চরিত্র, *আধুনিক কাব্য।*

সাহিত্যও কালের মতো সদা বহমান। ঊনবিংশ/বিংশ/একবিংশ শতকে রচিত ঐতিহাসিক নাটকের রচনা বৈচিত্র্য সত্যিই আমাদের বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করে –

“In the 20th century A.D. a considerably good number of dramas, some of them possessing commendable literary values, have been composed on different historical personages and historical events.”[25]

বিগত তিন শতকের সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটকের প্রেক্ষাপট সত্যিই মনে দাগ কাটে। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ভরত-চীনের যুদ্ধ, আইন-অমান্য আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ইত্যাদি পটভূমিতে সংস্কৃত নাট্যকারেরাও অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের লেখনীর ধারা। অনান্য প্রদেশিক ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষাতেও ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র হয়েছে মেবারের রাণা প্রতাপ সিং থেকে মারাঠাবীর শিবাজী। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সমগ্র ভারতবাসীকে নাড়া দিয়েছিল। তাই দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সংস্কৃতপ্রেমীরা ইতিহাসের পাতা থেকে অদমনীয় সব চরিত্রকে তাঁদের রচনায় স্থান দিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ বিশশতকের প্রথম দিকে বাংলা নাটকের ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করেছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত একাধিক ঐতিহাসিক নাটক। যেমন তাঁর রচিত *‘প্রতাপসিংহ’* (১৯০৫), *‘দূর্গাদাস’* (১৯০৫), *‘নূরজাহান’* (১৯০৮), ‘*মেবারপতন’* (১৯০৮) প্রভৃতি নাটকগুলি মুঘলযুগের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। যেখানে রাজপুত বীরত্বকে অসামান্য

[25] *20th Century Sanskrit Literature*, p. 30.

দক্ষতায় নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্যকার। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের *'রাজপুতজীবনসন্ধ্যা'* (১৮৭৮) এবং *'মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত'* (১৯৭৯) উপন্যাস দুটির নাম না করলেই নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনুপ্রাণিত সংস্কৃত সাহিত্যিকগণের রচনায় বাংলার বীর বিপ্লবীরা অনায়াসেই স্থান পেয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, বাঘাযতীন, ক্ষুদিরাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে সংস্কৃত নাটকের নায়ক অথবা নায়িকারূপে। এর পাশাপাশি জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও স্থান পেয়েছেন নাটকের মুখ্য চরিত্রে। সমস্ত নাটকের বর্ণনা দেওয়া এই পরিসরে সম্ভবপর নয়। তবুও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নাট্যকারদের রচিত নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা রইল। তালিকার প্রথমেই থাকছে বাঙালী নাট্যকারদের কৃতির পরিচয়-

নাটক	**নাট্যকার**	**বিষয়বস্তু**
বঙ্গীয়প্রতাপম্ **(১৯১৮)**	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	যশোরের বীর প্রতাপাদিত্যের দিল্লির সম্রাট আকবরের কাছে নতি স্বীকার না করা কাহিনী।
শিবাজীচরিতম্ **(১৯৪২)**	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	মারাঠাবীর শিবাজীর বীরত্ব ও অক্ষয় কীর্তির বর্ণনা।
মিবারপ্রতাপম্ **(১৯৪৫)**	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	মাবারের রাণা প্রতাপ সিং এর বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কথা।

চাণক্যবিজয়ম্	বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ	চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের কাহিনী।
অমরমঙ্গলম্	পঞ্চানন তর্করত্ন	রাণাপ্রতাপের পুত্র রাণা অমরসিং এর রাজত্বকালের বর্ণনা।
ভারতলক্ষ্মীনাটকম্	যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই এর রুখে দাঁড়ানোর কাহিনী।
স্বাতন্ত্র্য-সন্ধিক্ষণম্	শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	স্বাধীনতার প্রাক্কালে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী রূপটি ফুটে উঠেছে এই নাটকে।
স্বাতন্ত্র্যলক্ষ্মীনাটকম্	এস্. বি. বেলঙ্কর	লর্ড ডালহৌসীর নীতির বিরুদ্ধে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই এর দুঃসাহসিক প্রতিবাদ।
তিলকায়নম্	এস্. বি. বেলঙ্কর	নাটকের নায়ক বাল গঙ্গাধর তিলক। ব্রিটিশ শাসকের বিরূপ সমালোচনার জন্য শাসক গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হওয়া ও আরও অনেক ঘটনা এই নাটকের বিষয়বস্তু।
ভারতবিজয়ম্	মথুরা প্রসাদ দীক্ষিত	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে আগমন থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র।
দিল্লীসাম্রাজ্যম্	লক্ষ্মণসূরি	ব্রিটিশ শাসক চার্লস হার্ডিঞ্জের শালনকালে পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমন ও তাঁর আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেক নাটকটির বিষয়বস্তু।
স্বাতন্ত্র্য-যজ্ঞাহুতিঃ	নারায়ণ শাস্ত্রী	ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ১৯৪২ এর আন্দোলন রয়েছে নাটকটির কেন্দ্রবিন্দুতে।
অপূর্বশান্তিসংগ্রামঃ	বিশ্বনাথ কেশব ছত্রে	মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২৮ এর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এই নাটকের মুখ্য উপজীব্য বিষয়।

কটুবিপাকঃ	লীলা রাও দয়ালু	গান্ধীজীর দণ্ডিযাত্রা ও অসহযোগ আন্দোলন কিভাবে গুজরাটের সুবিশাল কৃষক সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল তার বর্ণনা।
রাষ্ট্রবন্ধুর্নাম	মতিনাথ মিশ্র	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান বর্ণিত হয়েছে এখানে।
বিজয়ভারতম্	জি. এস্. আর. কৃষ্ণমূর্তি	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের বীরত্ব এবং দেশাত্মবোধকে বিষয় করে নাটকটি রচিত।
ইন্দিরাবিজয়ম্	বেঙ্কটরত্ন	বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অসাধারণ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পারদর্শিতা এই নাটকের বিষয়বস্তু।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

নাট্যকারত্রয়ের জীবনী ও সারস্বত কৃতি

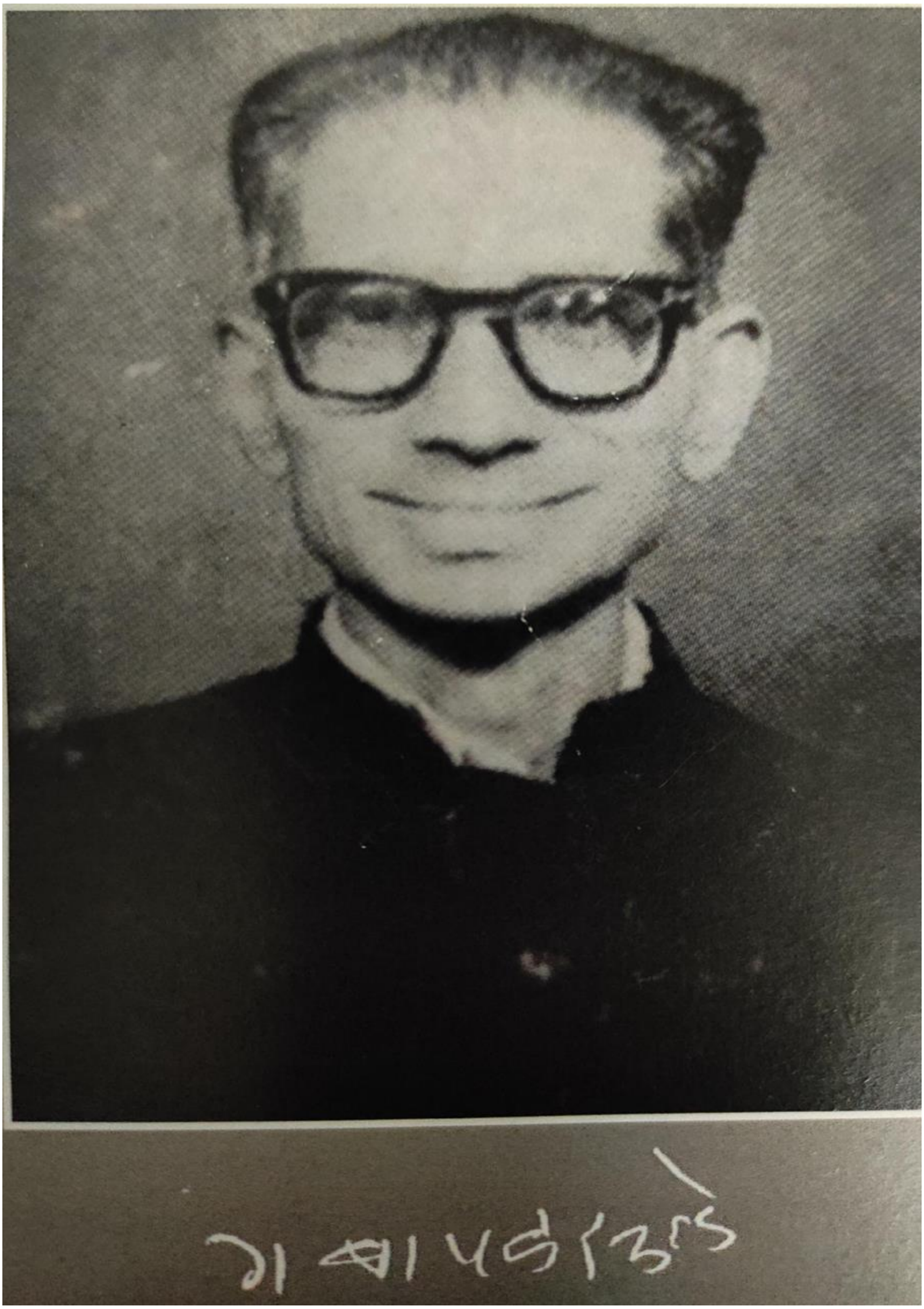

গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলে

গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলে (১৯২১ – ২০০৫)

গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলের জীবনী ও সারস্বত কৃতি

"প্রজ্ঞাপ্রকর্ষরসিকত্বসহাধিবাসং গ্রন্থেষু ভিন্নবিষয়েষু নিদর্শয়ন্তম্।

বাগ্দেবতাসমুপলব্ধকৃপাপ্রসাদং বন্দে গজাননগুরুং পরমাদরেণ।।"[26]

কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার সমন্বয়ের এক বিরল আধার হলেন কবি গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলে। তাঁর সুবিশাল রচনাভাণ্ডারের পরিচয় দেওয়ার আগে কবির ব্যক্তিজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারাষ্ট্রের সাতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এই বহুমুখী প্রতিভাধর কবি। তিনি ছিলেন বালকৃষ্ণ মহাদেব ও রাধাবাঈ এর একমাত্র সন্তান। শৈশব থেকেই তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পুণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ধাতুপাঠ বিষয়ক গবেষণায় পি. এইচ্. ডি উপাধি লাভ করেন।

১৯৪৯ – ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পুণে – র ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট – এ সহকারী গবেষকের পদে নিযুক্ত হন। এরপর ডেকান কলেজের সংস্কৃত অভিধান বিভাগে উপ-সম্পাদকের পদে আসীন হন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইউ. জি. সি – র পরিদর্শকের

[26] *সমর্পণম্*, পৃ. ১৫৪

কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি পুণে বিশ্ববিদ্যলয়েই প্রাকৃত অভিধান বিভাগের সম্পাদক হন।

।। **গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলের রচনাপঞ্জী** ।।[27]

মৌলিক রচনা

১. **মহাকাব্য** – *বৈনায়কম্*

২. **দৃশ্যকাব্য**

সমসাময়িক সমস্যাশ্রিত – ক. *সমানমস্তু বো মনঃ,* খ. *উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়*

আপাত ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রিত - *ভাসোঽহাসঃ*

জীবনীমূলক - *ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্*

৩. **গদ্যকাব্য** – ক. *বিনায়ক-বীরগাথা,* খ. *বিবেকানন্দচরিতম্*

অনূদিত রচনা

১. কাব্য – ক. *অগ্নিজা,* খ. *কমলা*

গ. *তুকা ব্যক্তি*

২. **নাটক** – ক. *ভ্রাতৃকলহ,* খ. *অথাতো জ্ঞানদেবোঽভূৎ,* গ. *ধন্যোয়ং গায়নী কলা,* ঘ. *যথা রায়দুর্গো জাগর্তি,* ঙ. *অত্র মৃত্যুর্বিলজ্জিতঃ,* চ. *অন্ধং যুগম্*

---

[27] গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলের রচনাপঞ্জীর জন্য অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায় বিরচিত '*G. B. Palsule (1921-2005)*' – এই গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি।

❖ শাস্ত্রীয় রচনা

১. *Sanskrit Dhatupathas: A Critical Study*

২. *A Concordance of the Sanskrit Dhatupathas*

৩. *কবিকল্পদ্রুমঃ* (বোপদেবীয় ধাতুপাঠের সংস্করণ)

৪. *মহাভাষ্যদীপিকায়াঃ কতিপয়খণ্ডানাঞ্চিকিৎসকসম্পাদনম্*

৫. *Sixty Upanisads of The Vedas*

গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলের মৌলিক ও শাস্ত্রীয় রচনা এবং প্রবন্ধাবলির তালিকা সুদীর্ঘ। প্রতিটি কাব্য বা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনার অবকাশ এই অভিসন্দর্ভের পরিসরে সম্ভব নয়। তাই নির্বাচিত কয়েকটি কাব্যের আলোচনার মধ্যে দিয়ে পলসুলের অনন্যসাধারণ কবি প্রতিভার উপর সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

বৈনায়কম্

২৫টি সর্গাত্মক একটি মহাকাব্য। মুখ্য চরিত্রে বিনায়ক দামোদর সাভারকার। মহাকাব্যটি দেশপ্রেমিক সাভারকারের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের একটি প্রকৃত মুকুর। মুক্তির দেবীর আবাহনের মধ্যে দিয়ে মহাকাব্যটির সূত্রপাত হয়। তারপর সাভারকারের বর্ণনা, যাঁকে তাঁর ভাগ্য সাফল্য ছাড়া বাকি সমস্ত কিছু দিয়েছেন। সাভারকারের জন্মবৃত্তান্ত, বেদান্তের অধ্যয়ন, বাল্যকাল থেকেই তার প্রখর মেধা ইত্যদির বর্ণনা আছে এখানে। তাঁর জীবনের তিনটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা – তাঁর

মায়ের মৃত্যু, স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যু এবং পুত্রের মৃত্যুর পর কিভাবে তাঁর ভ্রাতৃবধূ তাঁর দ্বিতীয় মা হয়ে ওঠে সেই বর্ণনাও আছে কাব্যটিতে। এছাড়াও সাভারকারের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন সংস্থার পরিচয়, বিবিধ বিষয়ে তাঁর নির্ভীক মতপ্রদর্শন, আন্দামানে কারাগার জীবনের একাকিত্ব ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে মহাকাব্যটিতে। এখানে মহাকাব্যটির সর্গগুলির নামোল্লেখ করা হল –

প্রথম সর্গ	ভবো হি রাষ্ট্রাভ্যুদয়ায়
দ্বিতীয় সর্গ	প্রতিজ্ঞা
তৃতীয় সর্গ	সীমোল্লঙ্ঘনম্
চতুর্থ সর্গ	শত্রুশিবিরে প্রবেশঃ
পঞ্চম সর্গ	শত্রুশিবিরে স্বাতন্ত্র্যযুদ্ধস্মৃতিমাননম্
ষষ্ঠ সর্গ	শস্ত্রাধিগমঃ
সপ্তম সর্গ	মদনলালহৌত্যাত্ম্যম্
অষ্টম সর্গ	আকুলাঃ, সাগর প্রাণাঃ
নবম সর্গ	আপৃচ্ছামহে.....পুনর্দর্শনায়
দশম সর্গ	হনুমৎপ্লুতিঃ
একাদশ সর্গ	জীবিতদ্বয়াত্মকং নির্বাসনম্
দ্বাদশ সর্গ	অন্দমান-বনবাসারম্ভঃ
ত্রয়োদশ সর্গ	প্রথমং মহাযুদ্ধম্
চতুর্দশ সর্গ	পুরনাগমনম্
পঞ্চদশ সর্গ	স্থানবদ্ধস্য সমাজসুধারণা

ষোড়শ সর্গ	হিন্দুসভানেতৃতা
সপ্তদশ সর্গ	মহাযুদ্ধম্, ১৯৪২ আন্দোলনঞ্চ
অষ্টাদশ সর্গ	গ্রহণগ্রস্তঃ অরুণোদয়ঃ
ঊনবিংশ সর্গ	রক্তরঞ্জিতং স্বাতন্ত্র্যম্
বিংশ সর্গ	অভিযোগঃ
একবিংশ সর্গ	অভিনবভারতবিসর্জনং সিন্দুসূক্তঞ্চ
দ্বাবিংশ সর্গ	হিন্দুহৃদয়সম্রাট্ হিন্দুসংঘটকঃ
ত্রয়োবিংশ সর্গ	মৃত্যুঞ্জয়বীরপূজা
চতুর্বিংশ সর্গ	ভারতস্য জয়পরাজয়ৌ
পঞ্চবিংশ সর্গ	আত্মার্পণম্

বিবেকানন্দচরিতম্

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করে রচিত একটি অনবদ্য গদ্যকাব্য। পলসুলে এই রচনায় বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিষয়ক কিছু নিয়মাবলির বর্ণনা করেছেন। সমগ্র কাব্যটি ১৮টি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। বিবেকানন্দের জন্ম, বাল্যকাল, ধর্মপ্রধান দেশ হিসেবে ভারতবর্ষের বর্ণনা, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, বেদান্তের চর্চা, বিশ্বধর্মসম্মেলন, বিবেকানন্দের সমাজ সেবা, বিশ্বায়ন ও আরও অনেক বিষয় কাব্যটিতে বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কাব্যটিতে বিবেকানন্দের আদর্শ ফুটে উঠেছে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ, রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ, সন্ন্যাসী হিসেবে তাঁর বিশ্বে পরিচিতি, হিমালয় থেকে কন্যকুমারী পর্যন্ত তাঁর বিহার এবং

সর্বত্র উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়া, ১৮৯৩ – এ শিকাগোতে বিশ্বধর্মসম্মেলনে বক্তব্য উপস্থাপন ইত্যাদি সমস্ত কিছু কাব্যটিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন কবি।

সমানমস্তু বো মনঃ

পলসুলে বিরচিত তিন অঙ্কের একটি অনবদ্য নাটক। 'India's Quest for Unity' এই বিষয়কে আশ্রয় করে ১৯৬১ সালে যে সংস্কৃত নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে এই নাটকটি সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের মর্যাদা পেয়েছিল। স্বাধীনতোত্তর ভারতের ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত।

নাটকটির নায়ক কৃষ্ণকান্ত, একটি অসমিয়া চরিত্র। সে ভাষাগত বিভেদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতপাতের বৈষম্য এই সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে। নাটকটির নায়িকা বীণা নোয়াখালি থেকে আসা একটি উদ্বাস্তু মেয়ে, যে সাম্প্রদায়িক কলহের শিকার। কৃষ্ণকান্ত মেয়েটিকে আশ্রয় দেয়। তারপর সে কৃষ্ণকান্তকে তার জীবনের করুণ কাহিনী শোনায় ও কৃতজ্ঞতা জানায়। উত্তরে কৃষ্ণকান্ত বলেন, তারা উভয়েই মানুষ, তাদের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তারপর দেখা যায় বীণাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কৃষ্ণকান্তকে সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হতে হয়। নাট্যকার নাটকের শেষে এক মিলনান্তক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

যথা রায়দুর্গো জাগর্তি

মারাঠী ভাষায় বসন্ত কানেটকর বিরচিত 'রায়গড়ালা জেবহা জাগ যেতে' – র সংস্কৃত অনুবাদ করেন জি. বি. পলসুলে। নাটকটির বিষয়বস্তু হল মারাঠাবীর

শিবাজী ও তার পুত্র শম্ভুজীর সম্পর্ক। বিভিন্ন সামরিক ক্রিয়াকর্মে ব্যস্ত থাকার সুবাদে শিবাজী তার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের দিকে নজর দিতে পারেননি। তার ফলে পুত্র পিতাকে ভুল বুঝে মহারাষ্ট্রের শত্রু মুঘল সম্রাটের আশ্রয়প্রার্থী হন। এর ফলে ব্যথিতহৃদয় শিবাজী যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বুঝিয়ে পুত্রকে ফিরিয়ে আনলেও কিছুদিনের মধ্যেই সে দেহত্যাগ করেন।

অত্র মৃত্যুর্বিলজ্জিতঃ

এটিও কানেটকর বিরচিত মারাঠী নাটক ‘ইথে ওশালা মৃত্যু’ – র সংস্কৃত অনুবাদ। নাটকের নায়ক শম্ভুরাজ। মুঘলসম্রাট ঔরঙ্গজেব অসংযমী শিবাজীপুত্র শম্ভুজীকে বন্দী করে নৃশংস অত্যাচারের পর তাকে হত্যা করেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় শম্ভুজী অসাধারণ মনোবল প্রদর্শন করেন, যা দেখে মৃত্যুও যেন লজ্জা পেল। এর থেকেই নাটকটির এরূপ নামকরণ।

ভাসোঽহাসোঃ

পলসুলে বিরচিত তিন অঙ্কের নাটক। আমরা সংস্কৃতানুরাগীরা সকলেই মহাকবি ভাসের ১৩টি নাটক সম্পর্কে সুপরিচিত। কথিত আছে যে, সমালোচকগণ পরীক্ষার জন্য ভাসের নাটকগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে ‘*স্বপ্নবাসবদত্তম্*’নাটকটি অক্ষত থাকে। এর থেকে নাটকটির উৎকৃষ্টত্ব প্রমাণিত হয়। ‘ভাসের নাটকের অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন কেন হল’ – এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতেই নাট্যকার পলসুলে আমাদের ‘*ভাসোঽহাসঃ*’ নাটকটি উপহার দিলেন। *‘ভাসোঽহাসঃ’* অর্থাৎ ‘হাসিবিহীন ভাস’। নাটকটির নায়ক মহাকবি ভাস, যিনি আপোসহীন, চাটুকারিতা মানেন না,

অর্থলোভে অথবা যশোলোভে রাজরোষের ভয়েও তাঁর আদর্শচ্যুতি ঘটেনি। তাই ঈর্ষাপরায়ণ বসুমিত্রের মিথ্যা অভিযোগে 'ভাস' রাজদণ্ডের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। কিন্তু প্রত্যয়ী ভাস দণ্ডের থেকে রেহাই পেতে রাজার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি। তাই রাজরোষে তাঁর সবকটি নাটকের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন ভাসের শিষ্য শারদ্বত গুরুর প্রতি অসীম ভক্তিতে সবার অলক্ষ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেন।

Sanskrit Dhatupathas: A Critical Study

ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বে পলসুলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। সংস্কৃত ধাতুপাঠ বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যতম অংশ ধাতুপাঠের উপর একটি স্বচ্ছ ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি পাণিনির পূর্ববর্তী ব্যাকরণের ধারণা দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধাতু, অনুবাদ ও অনান্য পারিভাষিক দিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাকরণবিদ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যুভাতঃ সংস্কৃতং প্রতি

এই গ্রন্থে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে সংস্কৃতের উৎপত্তি দেখানো হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি সংস্কৃতে রচিত। গ্রন্থটিতে প্রচলিত কিছু সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। যেমন – স্বরভক্তি, অপিনিহিতি, সমীভবন, বিষমীভবন, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি

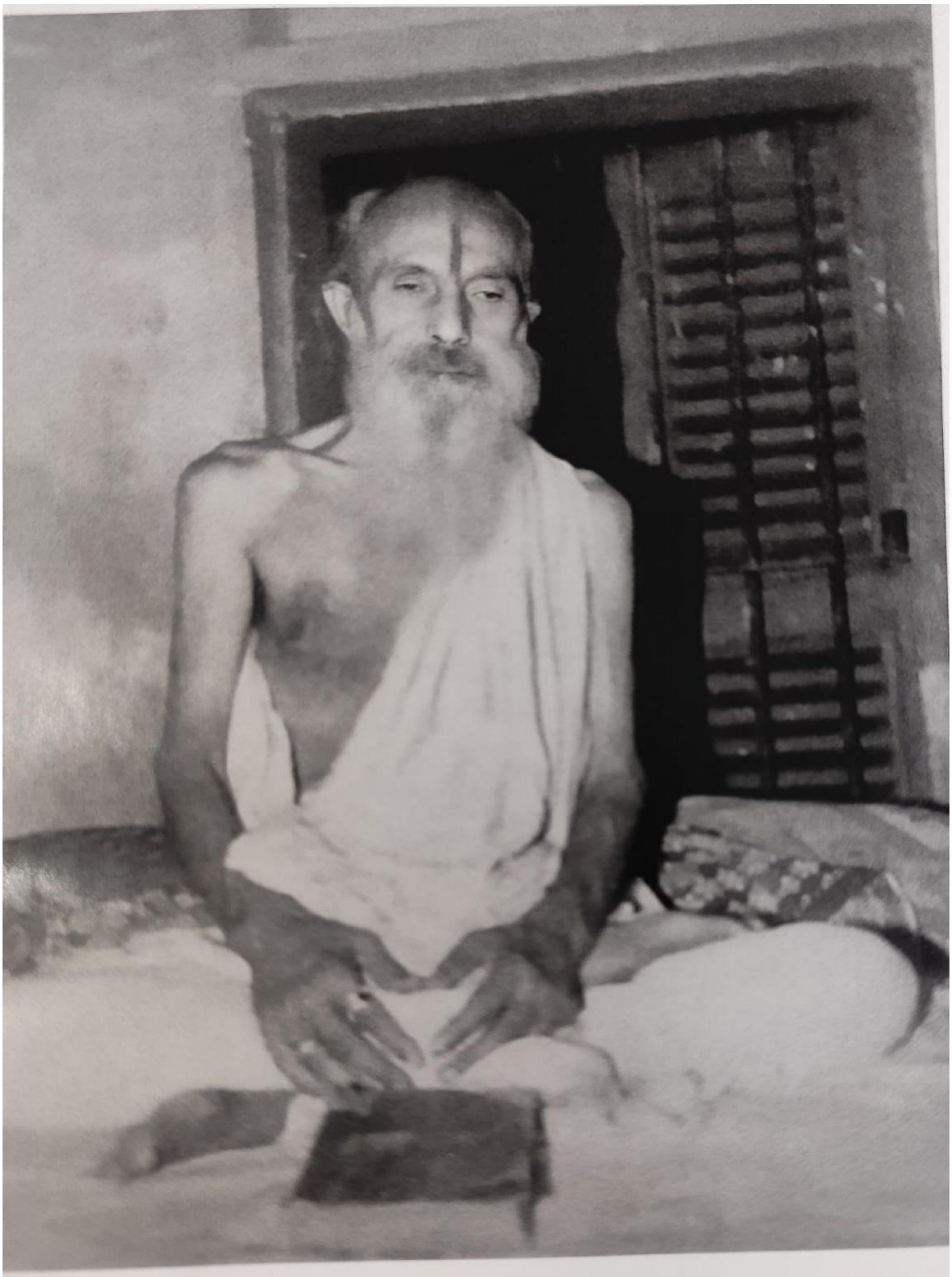

পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ
(১৯২৩—২০০৮)

পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ

নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ (১৯২৩ – ২০০৮)

নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের ব্যক্তিজীবন কর্মজীবন ও সারস্বতকৃতি

"নিত্যানন্দং ব্যপগতমলং যো জনেভ্যঃ প্রযচ্ছন্
নিত্যানন্দে নিজমপি মনো মজ্জয়ন্ যো ব্যরাজৎ।
নিত্যানন্দো বিমলহৃদয়ো য সদা নিত্যকৃত্যৈ-
র্নিত্যানন্দেঽমরভুবনকে সাম্প্রতং স প্রযাতঃ।।"[28]

ব্যক্তিজীবন

পণ্ডিত নিত্যানন্দের আদিনিবাস অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলায়। ১৯২৩ সালের ১০ই এপ্রিল ফরিদপুরে মামার বাড়িতে নিত্যানন্দের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন রামগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং মাতা দীনতারিণী দেবী। নিত্যানন্দের জন্মের পরই তাঁর পিতা কলকাতায় চলে আসেন এবং হাওড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শৈশব থেকেই সংস্কৃত শিক্ষায় অত্যন্ত অনুরাগী নিত্যানন্দ তাঁর পিতার সান্নিধ্যে কলকাতা ও হাওড়ার একাধিক চতুষ্পাঠীতে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বৈশেষিক, পুরাণ ও দর্শনে তীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। প্রাচীন ও নব্য – স্মৃতিশাস্ত্রের দুটি শাখারই উপাধি পরীক্ষায় তিনি স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

[28] *সমাজ ভারতী,* (শ্রাবণ-আশ্বিন), ১৮১৬ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৭

কর্মজীবন

নিত্যানন্দের কর্মজীবনের প্রারম্ভ হয় ১৯৪৩ সাল থেকে। কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বেই তিনি নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা জয়ন্তী দেবীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। নিত্যানন্দ তাঁর জীবনে সহধর্মিনীর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। হাওড়ার কোড়াবাগান চতুষ্পাঠীতে (অধুনা রামগোপাল চতুষ্পাঠী) পিতা রামগোপাল স্মৃতিরত্নের সহকারী অধ্যাপকরূপে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে মুগ্ধবোধ ব্যকরণের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে কলকাতার সরকারী কলেজে (অধুনা Govt. Sanskrit College and University) মুগ্ধবোধ ব্যকরণের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। হাওড়া সংস্কৃত সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি নিত্যনন্দ নিখিলবঙ্গ সেবা সমিতি, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ, বঙ্গ বিবুধ জননী সভা, কলকাতা এবং হাওড়ার কয়েকটি চতুষ্পাঠীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

১৯৯৪ সালে সাহিত্যজগতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ভারতসরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি সম্মানে ভূষিত হন। ৭০-এর দশকে কলকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের ভাবশিষ্য। নিত্যানন্দ তাঁর একাধিক কাব্যের মধ্যে দিয়ে ওঙ্কারনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এছাড়াও তাঁর সারস্বত জীবনে তৈলঙ্গস্বামী, সাধক বামাখ্যাপা, সর্বানন্দ স্বামী প্রমুখ মনীষীদের অবদান ছিল। মম. কালীপদ তর্কাচার্য,

পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রমুখের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। ২০০৮ সালের ৪ঠা আগস্ট তিনি এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অক্ষয়ধামে যাত্রা করেন। তাঁর সুবিশাল সাহিত্যকৃতি আমাদের কাছে আজও অক্ষয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

নিত্যানন্দ একাধারে ছিলেন নাট্যকার কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক। তাই তাঁর রচনাকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি –

।। নিত্যানন্দের রচনাপঞ্জী।।[29]

নিত্যানন্দের নাট্যসম্ভার –

১. **রামায়ণাশ্রিত নাটক** –

শ্রীরঘুজন্মবৃত্তান্তম্, রামবিবাহম্, সীতোদ্ধারণম্, ভরতগুণবন্দনম্ ইত্যাদি।

২. **মহাভারতাশ্রয়ী নাটক** –

কর্ণজীবনম্, ঘটোৎকচবধম্, দ্রৌপদীমানরক্ষণম্, ভীষ্মত্বলাভম্, তপোবলম্ প্রভৃতি।

৩. **বিভিন্ন পুরাণ অবলম্বনে রচিত নাটক** –

অকালবোধনম্, রক্তবীজবধম্, শুম্ভ-বিশুম্ভ-ঘাতনম্, চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশনম্, মধুকৈটভনাশনম্ ইত্যাদি।

[29] নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের রচনাবলী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায় বিরচিত '*শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ*' নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি।

৪. **পৌরাণিক দেবদেবীদের অবলম্বনে রচিত নাটক** –

সত্যনারায়ণাবির্ভাবম্, শনিপ্রভাবম্, সর্বাপৎতারকম্, ইত্যদি।

৫. **মহাপুরুষ বা মনীষীদের জীবন অবলম্বনে রচিত নাটক** –

বামাচরণবৈভবম্, ভক্তরামপ্রসাদম্, শ্রীসীতারামাবির্ভাবম্, ভক্তহরিদাসম্, মাতৃদর্শনম্ ইত্যাদি।

৬. **স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশপ্রেম অবলম্বনে রচিত নাটক** –

সুশীলবিজয়ম্, আত্মনিবেদনম্, দেশশত্রুনিপাতনম্, সুভাষবিজয়ম্, দেশবন্ধু-প্রকীর্তনম্ প্রভৃতি।

৭. **অনূদিত রচনা বা ভাষান্তরিত নাটক** –

মুকুটম্, সম্পাত্তিসমর্পণম্, গুপ্তধনম্, রাসমণিপুত্রম্, রহমৎখানবৃত্তান্তম্, পুত্রযজ্ঞম্, পুত্রপ্রত্যার্পণম্, সুমতিলাভম্, চিকিৎসাসংকটম্ ইত্যাদি।

৮. **প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে বিরচিত নাটক** –

গঙ্গামাহাত্ম্যকীর্তনম্, বিল্বমঙ্গলমঙ্গলম্, দেশরক্ষণম্, তপোনাশনম্, বেতালমিলনম্ ইত্যদি।

৯. **সামাজিক সমস্যার আশ্রয়ে কৃত নাটক** –

কৌলিণ্যপরিরক্ষণম্, বিষয়াকাঙ্খণম্, বিদ্বদ্দম্ভবিনাশমম্ প্রভৃতি।

১০. **সংস্কৃতভাষার দুরবস্থা আশ্রয়ে লিখিত নাটক** –

মাতৃহননম্, জননীশ্রাদ্ধবাসরম্ ইত্যাদি।

নিত্যানন্দের কাব্যকৃতি –

কবি নিত্যানন্দ ৭টি মহাকাব্য রচনা করেছেন। যথা –

১. *শঙ্করমহানুভবম্*

২. *শ্রীসীতারামদাসোঙ্কারনাথায়নম্*

৩. *তারকানাথবৈভবম্*

৪. *বামাচরণবৈভবম্*

৫. *তৈলঙ্গবৈভবম্*

৬. *সর্বানন্দবৈভবম্*

৭. *শ্রীজানকীনাথবন্দনম্*

এছাড়াও খণ্ডকাব্য, প্রশস্তিকাব্য, বন্দনাগাথা, শোকগাথা, অভিনন্দনবার্তা প্রভৃতি মিলিয়ে আরও অনেক রচনা আমরা পাই। এখানে কয়েকটি কাব্যের আলোচনা করা হচ্ছে –

১. ***গৌরবন্দনম্*** – চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনাগাথা

২. ***চৈতন্যশতকম্*** – এটিও চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে লেখা একটি শতককাব্য।

৩. ***সীতারামনবকম্*** – ৯টি শ্লোকে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন।

৪. ***গৌরীনাথপ্রশস্তিঃ*** – ১০টি শ্লোকাত্মক কাব্য। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর প্রশস্তি।

৫. ***জাতীয়পতাকাভিনন্দনম্*** – ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার অভিনন্দন এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

৬. ***তর্কাচার্যপরিচিতিঃ*** – কবি নিত্যানন্দ এই কাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্যতম সারস্বত গুরু কালীপদ তর্কাচার্যকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

৭. ***গণেশশতকম্*** – গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত একটি শতককাব্য।

৮. ***সরস্বতীবন্দনম্*** – ৬টি শ্লোকে বিরচিত দেবী সরস্বতীর বন্দনাগাথা।

৯. ***পশুপতিনাথবন্দনম্*** – কিংবদন্তী পণ্ডিতমূর্ধন্য পশুপতিনাথ শাস্ত্রীর (গৌরীনাথ শাস্ত্রীর পিতা) উদ্দেশ্য প্রণামাঞ্জলি।

১০. ***সম্পাদকীয়ম্*** – ১৯৬৭ সালে মম. কালীপদ তর্কাচার্য ‘সংস্কৃত সাহিত্য ইতিবৃত্তম্’ শীর্ষক ২৪৫টি শ্লোকে বিধৃত একটি কাব্যের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের ৫০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সেই কাব্যের অনুকরণেই নিত্যানন্দ এই কাব্যটি রচনা করেন। ৯০-র দশকে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতের দুরাবস্থায় যন্ত্রণাকীর্ণ কবি নিত্যানন্দ এই কাব্যের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের গৌরবজ্জ্বল দিন ফিরে আসার আকুতি জানিয়েছেন।

এখানে নিত্যানন্দ বিরচিত কয়েকটি নাটক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

১. ***বঙ্গকীর্তিবিধানম্***

নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত এবং প্রতিটি অঙ্ক আবার দুটি করে দৃশ্যে বিভক্ত। বিশ্ববরেণ্য রাজনীতিবিদ্ এবং স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন ও কীর্তি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। নান্দী শ্লোকে জন্মভূমির স্তুতি করা হয়েছে। নাটকটির বিষয়বস্তু হল – ২০০ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন জহরলাল নেহরু। বিধানচন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের আসন গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। নাটকটিতে দেখা যায় ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন। সমস্যা জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। একে একে উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলা, বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপন, শিল্প ও কৃষির উন্নতি, শিক্ষা জগতে তাঁর অবদান, কল্যাণী নগরী সম্বন্ধে পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটি নির্মাণ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রভৃতি নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকটির অন্তিম অঙ্কে নাট্যকার দেখিয়েছেন বাংলা বিধানচন্দ্রের কাছে কতটা প্রিয়। ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই হাজার হাজার মানুষ আসে বিধানচন্দ্রের জন্মদিনে তাকে অভিনন্দন জানাতে কিন্তু তাঁর ৮০ তম জন্মদিনে তিনি মৃত্যবরণ করেন। সমগ্র নাটকটি জুড়ে বিধানচন্দ্র রায়কে নানা বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে। যেমন -

‘বহুবিধকৃতিকর্মা’, ‘নিজসুখমবিচিন্ত্য জনানাং ক্ষেমকারী’, ‘সকলভুবনবন্দ্যঃ’ আরও কত কি।

২. *অমরবীরবৃত্তান্তম্*

বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর কীর্তি অবলম্বনে রচিত নাটক। নাটকটির প্রথমাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে বাগ্দেবীর বন্দনা। নান্দ্যন্তে সূত্রধারের ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথন থেকে জানা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গীকৃত এক মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরামের কীর্তি অবলম্বনে রচিত নাটকের অভিনয় হবে। প্রথমাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে ক্ষুদিরামের প্রবেশ। মঞ্চে এসেই তিনি ঘোষণা করেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি দেশজননীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে তার সন্তানেরা অন্ন, জল ও বস্ত্রহীন। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে লর্ড কার্জন বলছেন ভারত স্বর্ণভূমি। এই দেশের জনগণ যেন যথাযথ বিদ্যা লাভ না করতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। দেশের সমস্ত সম্পদ লুন্ঠন করতে হবে। অপরদিকে কিংসফোর্ড বলছেন বাঙালীরা খুব বুদ্ধিমান। তাই তাদের একত্রিত হতে দেওয়া যাবেনা। অতএব বঙ্গভঙ্গই একমাত্র কাম্য। পরবর্তী অঙ্কে বিপ্লবী অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, বিপিন পাল প্রমুখের কথোপকথনে জানা যায় ব্রিটিশের অত্যাচারে বাঙালীরা জর্জরিত। দেশের শিক্ষাদীক্ষার বৃদ্ধি নেই। ইতিমধ্যে সেখানে ক্ষুদিরাম প্রবেশ করলে ঋষি অরবিন্দ তাকে বলেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন নাশ হতে পারে। উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন দেশের মুক্তির জন্য যদি জীবন যায় তবে তা হবে মহাআনন্দের।

৩. *আত্মনিবেদনম্*

এই নাটকটিরও প্রেক্ষাপট ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম শহীদ প্রফুল্ল চাকীর আত্মত্যাগের কাহিনী এই নাটকের বিষয়বস্তু। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে আত্মহত্যা করেন এবং বীর আখ্যায় ভূষিত হন।

একথা বলাই বাহুল্য যে নিত্যানন্দ তাঁর নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে বাঙালীর সশস্ত্র বিপ্লবের এক দলিল পেশ করেছেন।

নিত্যানন্দের মধ্যে কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার বিরল সমন্বয় ঘটেছিল। এতক্ষণ নিত্যানন্দের মৌলিক কাব্য ও নাটকগুলির কথা বলা হয়েছে। তাঁর ভাবয়িত্রী প্রতিভার সাক্ষর স্বরূপ কয়েকটি মননশীল প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ তাঁর প্রবন্ধাবলীর বিষয় বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করলেও তাঁর স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহস্থের ব্যবহারিক জীবনে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন বেশ কিছু প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে। ধর্মশাস্ত্রের তাৎপর্য, দেবীমূর্তি স্থাপনের বিধি, অশৌচ এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ইত্যাদি। এছাড়াও দূর্গা, জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যবস্থা, প্রেতশক্তির অস্তিত্ব, জন্মতিথি পালন, মলমাসতত্ত্ব ও স্মার্ত রঘুনন্দনের একাধিক তত্ত্বের বিচার ও সমর্থন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে স্পর্শ করেছেন তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দিয়ে। এছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি শাস্ত্রগ্রন্থের নামোল্লেখ না করলেই নয়। বিশেষতঃ তন্ত্র, ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর অগাধ প্রবেশ ছিল। তাঁর অনূদিত কয়েকটি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের নাম হল- কালীতন্ত্র, ফেটকারিণীতন্ত্র, একাদশীতত্ত্ব, দায়ভাগতত্ত্ব,

দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব, মুগ্ধবোধ ব্যকরণের কয়েকটি অধ্যায় প্রভৃতি। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলির জন্য আপামর বাঙালী তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

নাট্যের প্রয়োগতত্ত্ব সম্পর্কেও নিত্যানন্দের সুষ্ঠু ধারণা ছিল। তাঁর নাটকগুলিতে নান্দী, প্রস্তাবনা, সূত্রধার কর্তৃক পারিপার্শ্বিককে 'মারিষ' বলে সম্বোধন ইত্যাদি ঐতিহ্যের পাশাপাশি নাটকের দৃশ্যবিভাগ, প্রাকৃত ভাষার বর্জন, বিবিধ বিষয়ের উপস্থাপনা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে আধুনিকতার প্রয়োগ সূচিত করে। নিত্যানন্দ শুধু নাট্যকার-ই ছিলেন না, নাট্যনির্দেশকও ছিলেন। তাঁর প্রতিটি নাটকই মঞ্চোপস্থাপনের উপযোগী করে রচিত। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি নাটক অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় নিত্যন্দের নাটকগুলি যেন 'দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্' – এই উক্তিটিকে সার্থক করে তুলেছে।

रामकृष्ण शर्मा—पुत्र पं० शिवराम शास्त्री

রামকৃষ্ণ শর্মা

রামকৃষ্ণ শর্মা

রামকৃষ্ণ শর্মা (জন্ম - ১৯৩৬)

রামকৃষ্ণ শর্মার ব্যক্তিজীবন[30] –

ভারতীয় সংস্কৃতি যতটা প্রাচীন, তার থেকেও প্রাচীন হল ভারতীয় সাহিত্য। ভারতীয় সাহিত্যের অনুশীলন থেকে জ্ঞাত হয় যে, সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রী বর্ধনকারী কবি ও নাট্যকারেরা নিজেদের বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করার ব্যপারে খুব উদাসীন ছিলেন। এর কারণ হিসেবে বলা যেরে পারে হয়ত তারা নিজেদের পরিচয় দান অপেক্ষা গ্রন্থ রচনায় বেশী মনোনিবেশ করেছিলেন অথবা, হয়ত তারা নিজেদের সময়ের থেকে এতটাই এগিয়ে ছিলেন যে, গ্রন্থে তাঁদের পরিচয় দেওয়া উচিৎ মনে করেননি। কিন্তু বর্তমানে কবিরা তাঁদের স্বীয় পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। কবি রামকৃষ্ণ শর্মা ও এর ব্যতিক্রম নন।

রামকৃষ্ণ শর্মার জন্ম হয় ১৯৩৬ সালের ১৫ই মে উত্তরপ্রদেশের গাড়ওয়াল জেলার চোপড়াকোট গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রী শিবরাম শাস্ত্রী ও মাতা শ্রীমতী ডওলি দেবী। তাঁর মাতা-পিতা উভয়েই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রামকৃষ্ণ শর্মা বাল্যকাল থেকেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সমস্ত পরীক্ষায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ক শিক্ষা তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে পেয়েছিলেন।

---

[30] কবি রামকৃষ্ণ শর্মার ব্যক্তিজীবন, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও রচনাবলীর পরিচয় '*Sanskrit Natya Parampara me Bangladesodayam Ek Samikshatmak Adhyan*' – এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ থেকে সংগ্রহ করেছি।

শ্রী শর্মা ভারত সরকারের মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার সহকারী পরামর্শদাতা ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও সুরভারতীর সেবায় ও উন্নয়নে সতত নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তিনি অনেক শিক্ষামূলক ভ্রমণ করেছিলেন, যার ছাপ তাঁর ‘বাংলাদেশোদয়ম্’ নাটকে পড়েছে।

রামকৃষ্ণ শর্মার শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয়

পরীক্ষার নাম বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থান

প্রথমা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় বেনারস।

পূর্ব মধ্যমা সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস।

উত্তর মধ্যমা সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস।

শাস্ত্রী ইংরেজী সাহিত্য সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস।

আচার্য সংস্কৃত সাহিত্য সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস।

ইন্টারমিডিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষৎ, এলাহাবাদ।

এম্. এ. সংস্কৃত আগরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরা।

বিদ্যা বাচস্পতি গুরুকুল মহাবিদ্যালয়, জ্বালাপুর, উত্তরপ্রদেশ।

কর্মক্ষেত্র –

ক. সহায়ক সংস্কৃত অধ্যাপক, আর. এস. এম. বি. চন্দৌসী, উত্তরপ্রদেশ।

খ. প্রধান আচার্য, সনাতন ধর্ম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, রামপুর, উত্তরপ্রদেশ।

গ. শিক্ষা নির্দেশক, ভারত সরকার।

ঘ. সহায়ক শিক্ষা অধিকারী, মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রালয়।

॥ রামকৃষ্ণ শর্মার রচনাপঞ্জি ॥

প্রকাশিত রচনা –

ক. *বাংলাদেশোদয়ম্* ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের সংস্কৃত বিভাগ থেকে পুরস্কৃত হয় নাটকটি এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বেঙ্কটরমণ এর দ্বারাও পুরস্কৃত হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে।

খ. *বিড়ম্বনা*।

গ. *প্রণয়বিচ্ছেদঃ*।

ঘ. *কণ্বাশ্রমঃ*।

ঙ. পারস্কর গৃহ্য সূত্রের টীকা *অর্থ ভাস্কর*।

চ. *সংস্কৃত এবং অভিনব ভারত* (হিন্দী ভাষায় রচিত সন্দর্ভ পুস্তক)।

ছ. *উলা সীনী* (হিন্দী গান)।

অপ্রকাশিত রচনা

ক. *অভিনবভারতচম্পূঃ* (সংস্কৃত)

খ. *গীতমঞ্জরী* (সংস্কৃত গান)

গ. *জ্ঞান মঞ্জরী* (হিন্দী গান)

ঘ. *কালিদাস কা জন্ম স্থান* (হিন্দী)

ঙ. *সংস্কৃত এবং মর্ডান ইন্ডিয়া* (ইংরেজী ভাষায় রচিত সন্দর্ভ পুস্তক)

এছাড়া মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন সম্মেলনে প্রদত্ত একাধিক প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন।

কবির প্রাপ্ত উপাধি –

ক. শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ কলকাতা - সাহিত্য ভারতী

খ. নিখিলবঙ্গ সংস্কৃত সেবা সমিতি কলকাতা- কাব্য রত্নাকর

গ. বেদ শোধ সংস্থান, জয়পুর - বেদ পণ্ডিত

ঘ. সংস্কৃত শোধ সংস্থান, রায়বেরেলী - কালিদাস পুরস্কার

ঙ. হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ, উত্তর প্রদেশ - সাহিত্য মহোপাধ্যায়

এখানে তাঁর কয়েকটি রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল –

বিড়ম্বনা

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর নাগ প্রকাশক থেকে প্রকাশিত ষষ্ঠাঙ্কযুক্ত 'বিড়ম্বনা' নাটকে মহাভারতের অন্যতম চরিত্র কর্ণের জীবনচরিত ফুটে উঠেছে। নাটকের প্রস্তাবনায় দেখা যায় শূরসেনপুত্রী পৃথা তাঁর কুমারী অবস্থায় জাত প্রথম পুত্রকে পেটিকায় ভরে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিতে আসে। তারপর বিষ্কম্ভক অংশে দুই মধ্যম পাত্রী কর্ণের দানশীলতা, ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলী, প্রভুভক্তি, শস্ত্রচালনে পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকে।

দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনা হয় পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রচালনার প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে। মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনের অস্ত্রচালনের পারদর্শিতায় সকলে মুগ্ধ হয়। তারপর সেখানে অর্জুনের চেয়েও সুদক্ষ অস্ত্রচালনা করে কর্ণ সকলকে বিস্মিত করে এবং অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানায়। এরপর আবার বিষ্কম্ভকে পূর্বোক্ত দুই মধ্যম পাত্রীর কথোপকথন থেকে জ্ঞাত হয় যে কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ নিশ্চিতভাবেই অনুষ্ঠিত হবে।

তৃতীয়াঙ্কে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা কুন্তী কর্ণের কাছে প্রেরিত হয়ে বলেন –

"পাণ্ডবৈঃ সহ যুদ্ধস্ব ভুঙ্ক্ষ্ব ত্বং পাণ্ডবীশ্রিয়ম্।
পশ্যন্তু কৌরবাঃ সর্বে কর্ণার্জুনসমাগমম্।।"[31]

কর্ণ কুন্তীর এই অবেদনকে পরিহার করেন কিন্তু তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন –

"ন হনিষ্যামি তে পুত্রান্ কেবলাদর্জুনাদৃতে।
সার্জুনা বা সকর্ণা বা পঞ্চপুত্রাঃ পৃথা ভবেৎ।।"[32]

এরপর অঙ্কাবতারে দুই বেতালের বার্তালাপে রণক্ষেত্রের ভয়ানক রূপ চিত্রিত হয়েছে। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের মৃত্যু সংবাদে চতুর্থ অঙ্কের সূচনা হয়। তারপর কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধাবসরে কর্ণের রথের চাকা পঙ্কে নিমজ্জিত হলে অর্জুন নিরস্ত্র কর্ণকে হত্যা করেন।

---

[31] *নাট্যত্রয়ী*, পৃ. ৪৪

[32] তত্রৈব, পৃ. ৫০

পঞ্চমাঙ্কে দেখা যায় যুধিষ্ঠির পুরোহিতের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত স্বজনদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করছেন। সেই সময় কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যেও তর্পণ করতে বলেন। ষষ্ঠাঙ্কে দেখা যায় যুধিষ্ঠির নিজেকে স্ববংশনিধনকারী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার হত্যাকারী হিসেবে ভর্ৎসনা করতে থাকেন।

কবি রামকৃষ্ণ শর্মা তাঁর এই নাটকটির বিষয়বস্তু, অঙ্কসংখ্যা, নান্দী, ভরতবাক্য ও অন্যান্য সমস্ত পারিভাষিক দিকের ব্যবহার প্রাচীন ঐতিহ্য মেনেই করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি অভিনবত্বও এনেছেন। যেমন – নাটকের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রের মুখে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার এবং সর্বোপরি নাটকে নায়ক কর্ণের মৃত্যু দেখানো। এছাড়াও নাটকে করুণ রসের ব্যবহারেও তিনি আলংকারিক বিশ্বনাথের মতকে লঙ্ঘন করেছেন।

প্রণয়বিচ্ছেদঃ

এটিও ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনা সংস্থা নাগ প্রকাশক। এটি একটি একাঙ্ক নাটক। নাটকটিতে রাজা দুষ্যন্ত, উপাধ্যায়, বিদূষক, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, মাতা গৌতমী ও শকুন্তলা – এই কয়েকটি চরিত্রের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

নাটকটির সূচনা হয় বিদূষক ও রাজার কথোপকথন দিয়ে, যেখানে বিদূষক বিভিন্ন রকম ভাবে রাজার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন রমণীদের কথা বলে রাজাকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজা উত্তরে বলেন –

"বাল্যে লোকার্তিজিজ্ঞাসাং যৌবনে কষ্টকর্মতাম্।
প্রশিক্ষয়ন্তি লোকান্ বৃদ্ধত্বম্ রাজকর্মণি।।"[33]

এমন সময় সেখানে শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও মাতা গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলা প্রবেশ করে। গর্ভবতী শকুন্তলাকে তারা রাজার কাছে নিবেদন করতে আসে। কিন্তু রাজা দুষ্যন্ত সমস্ত কিছু অস্বীকার করেন। তখন তারা কণ্বাশ্রমে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের প্রণয় ও গান্ধর্ব বিবাহের কথা জানালে রাজা তা স্মরণ করতে পারেনা। এমতাবস্থায় শকুন্তলা দুষ্যন্তকে তাঁর নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি দেখানোর চেষ্টা করলে সেটি খুঁজে পায়না। গৌতমী অনুমান করেন যে শচীতীর্থে জলপান করার সময় হয়তো অঙ্গুরীয়কটি স্খলিত হয়েছে। এরপর শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলাকে অবিশ্বাস করে গৌতমীকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে প্রস্তুত হন। গৌতমী ক্রন্দন করতে করতে বলেন, শকুন্তলার সঙ্গে খুব অবিচার হল। এই বলে সকলে ভূমিতে লুন্ঠিত শকুন্তলাকে রেখে সেই স্থান ত্যাগ করে। তখন নেপথ্যে এক করুণ গীত শোনা যায়। এই হল নাটকটির বিষয়বস্তু।

নাটকটির বিষয়বস্তু যদিও অতি পরিচিত তথাপি একাঙ্ক নাটক অর্থাৎ লঘুনাট্য বর্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত। এই লঘুনাটকে একদিনে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা করা হয়। ইতিবৃত্ত অনুসারেই লঘুনাটকের রস নির্ধারিত হয়। যেমন – আলোচ্য

[33] *প্রণয়বিচ্ছেদ*, পৃ. ৮২

নাটকের অঙ্গীরস হল করুণ। এই বিষয়ে আলংকারিক অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র বলেছেন –

"একাহচরিতঞ্চৈব লঘুনাট্যে প্রযোজয়েৎ।

সংবাদবহুলা ভাষা ব্যঙ্গগর্ভাহত্র সম্মতা।।

রসঃ কোহপি ভবেদঙ্গী নাট্যবৃত্তাহনুগুণ্যতঃ।

লক্ষ্যমেকং পরং তস্য ভবেদ্রঙ্গপ্রসাদনম্।।"[34]

সংস্কৃত এবং অভিনব ভারত

গ্রন্থটি ১৯৮৯ সালে নাগ প্রকাশক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হিন্দী ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভারতী এবং ভারতের আন্তঃসম্পর্ক, সংস্কৃতের উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রভাব বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, হ্রাস, বিকাশ এবং উন্নতি রাষ্ট্রীয় জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে তার তর্কপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থটির অধ্যায় বিন্যাস দেখলেই এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

প্রথম অধ্যায় – সংস্কৃত ভাষা কা উদ্গাম ঔর বিকাস।

দ্বিতীয় অধ্যায় – ভারতীয় জনজীবন পর সংস্কৃত কা প্রভাব ।

তৃতীয় অধ্যায় – বর্তমান যুগ মেঁ সংস্কৃত কী সমুন্নতি।

চতুর্থ অধ্যায় – উন্নীসবীঁ শতাব্দী মেঁ ভারত মেঁ সংস্কৃত কী স্থিতি।

---

[34] *অভিরাজযশোভূষণম্*, পৃ. ২০৫

পঞ্চম অধ্যায় – বীসবীঁ শতাব্দী কে পূর্বার্ধ তক ভারত মেঁ সংস্কৃত কী স্থিতি।

ষষ্ঠ অধ্যায় – পালী প্রাকৃত এবং সংস্কৃত।

সপ্তম অধ্যায় – স্বতন্ত্র ভারত মেঁ সংস্কৃত কী স্থিতি।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ – একটি সমীক্ষা

বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ – একটি সমীক্ষা

নাটক- *বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্*। নাট্যকার – নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ। রচনা কাল – ১৯৮৭। অঙ্কসংখ্যা – ৫। প্রধান চরিত্র – বাঘাযতীন, টেগার্ড সাহেব, মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয় প্রমুখ।

নাটকটির কথাবস্তু

প্রথমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য – নান্দী শ্লোকে[35] ভারতমাতার বন্দনা করা হয়েছে। এরপর সূত্রধার মঞ্চে এসে জন্মভূমির স্তুতি করেন। সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, চতুর্দিকে স্বাধীনতা উৎসব পালিত হচ্ছে। তাই তাদেরও উচিত নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এই মহোৎসব পালন করা। পারিপার্শ্বিক বলে গতানুগতিক নাটকের অভিনয় তারা করবেন না। স্বাধীনতার জন্য যে সকল বীরেরা আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদের জীবনকে আশ্রয় করেই নাটক অভিনীত হবে। জন্মভূমির চরণে সমর্পিত আদর্শভূত পুণ্যচরিতকে আশ্রয় করে রচিত নাটকেরই প্রদর্শন হবে।

প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য – এই দৃশ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন ও তার চারজন সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেণ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পালের বার্তালাপ দেখা যায়। যতীন্দ্রনাথ বলেন, 'বৈদেশিক শাসন ও

---

[35] যস্যাঃ ক্রোড়ে বসতিরিহ বৈ মানাবাং সুখায়।

খাদ্যং পেয়ন্ত্বমৃতসদৃশং শুদ্ধবস্ত্রং তথৈব॥

হৃষ্টা চাসৌ নিজসুতগুণে সন্দদাত্যত্র দেশো।

পায়ান্মাতা নিখিলবিপদঃ সৈর যুষ্মান্ সদৈব॥

শোষণ থেকে যে কোন উপায়েই জননীকে (জন্মভূমিকে) রক্ষা করতেই হবে। আজ দেশমাতা মানহীনা, শোষিতা ও ধনসম্পদবর্জিতা। দেশের সংস্কৃতি আজ লুণ্ঠিতা। বিকৃত হয়েছে শিক্ষা ও ইতিহাস। যদি এই শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত না করতে পারি তবে এই পুণ্যদেশে জন্মগ্রহণের সার্থকতা কোথায়?'[36] বাকি চারজনও যতীন্দ্রনাথের সমর্থনে একই সুরে কথা বলেন। সকলেই দেশের মুক্তির জন্য আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত। চিত্তপ্রিয় আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তারা অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ করবে কি করে। তাঁর এই আশঙ্কার নিরসন করে যতীন্দ্রনাথ জানায় যে, জার্মানি থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের দেশ থেকেই সংগ্রহ করা হবে। এরপর তিনি সবাইকে নিজ নিজ দৈহিক শক্তি ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন।

দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য – বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারতসচিবের বার্তালাপ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতসচিবের কাছে বিপ্লবীদের বিষয়ে জানতে চাইলে ভারতসচিব বলেন, সংযোগ

[36] শাসনাচ্ছোষণাত্তাবদত্যাচারিবিদেশিনাম্।

রক্ষণীয়া জনন্যেব যেন কেনাপ্যুপায়তঃ।।

মানহীনাদ্য মাতা হা ম্লেচ্ছশাসনমাগতা।

শোষিতা সর্বতো দেবী বর্জিতা ধনসম্পদা।।

লুণ্ঠন্তে সম্পদঃ সর্ব্বাঃ নামপ্যতে সংস্কৃতির্নিজা।

শিক্ষা চ বিকৃতিং নীতা চেতিহাসস্তথৈব হি।।

এতচ্ছাসনতো মুক্তাং কর্তুং ন শক্যতে যদি।

এতদ্দেশে মহাপুণ্যে সার্থক্যং কিন্নু জন্মনঃ।।

রাখা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কয়েকজন মূর্খ ব্যক্তি নিজেদের বিপ্লবী মনে করে পতঙ্গের মতো বহ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। একথা শুনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাকে আদেশ দেন যে, বিষয়টিকে হালকা ভাবে না নিয়ে যত্নসহকারে অনুসন্ধান করে সমস্ত ব্যবস্থা নিতে। ভারতসচিব বিষয়টির গুরুত্ব জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা সুদূরপ্রসারী। তারা বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করছে। আর এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে যতীন্দ্র নামের একজন বাঙালী। একথা শুনে ভারতসচিব বলেন বাঙালীর উপযুক্ত শাসনের ব্যবস্থা তিনি করবেন।

দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য - যতীন্দ্রনাথের স্বগতোক্তি দিয়ে এই দৃশ্যের সূত্রপাত। যতীন্দ্রনাথ ভাবতে থাকেন কেন অস্ত্রপূর্ণ জাহাজের আসতে বিলম্ব হচ্ছে? তারা কি অস্ত্র পাঠায়নি অথবা শত্রুরা সব জানতে পেরেছে? এখন কি করা উচিৎ? আত্মারাম অস্ত্র সংগ্রহের সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল, তাই তার কাছেই সংবাদ থাকবে। এরপর তিনি প্রকাশ্যে যাদু অর্থাৎ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখার্জীকে বলেন যে, শ্যামদেশ অর্থাৎ থাইল্যান্ড থেকে জার্মান প্রতিনিধির মাধ্যমে ম্যাভারিক নামক জাহাজে করে অস্ত্র আসার কথা ছিল কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। এই কথা বলে যতীন্দ্র যাদুকে আত্মারামের কাছে প্যাঠায় সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য এবং দেশমাতার উদ্দেশ্যে বলেন যে, তার পুত্রদের সমস্ত প্রয়াস কি ব্যর্থ হবে, শত্রুদের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভে কি তারা সমর্থ হবে? দেশজননীর নিকটে তিনি শক্তি, বুদ্ধি, সাহস ও ধৈর্য প্রার্থনা করেন।

তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য – বঙ্গরাজ্যপাল টেগার্ড সাহেবকে জানায় যে ইংল্যান্ড থেকে ভারতসচিব তাদের কর্তব্যে অবহেলা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কারণ তারা বিপ্লবীদের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি দেয়নি। এর উত্তরে টেগার্ড জানায় যে, বিপ্লবীদের নাম শোনা মাত্রই তাঁদের আটক করা হচ্ছে এবং তাঁদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। তবুও ভারতসচিব তৃপ্ত কেন হচ্ছেন না? রাজ্যপাল তখন বিদেশ থেকে অস্ত্র আনয়নের বিষয়টি তাকে জানালে সে বলে যে বা যাঁরা এই কাজ করছে তাঁদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে, হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে। এই কথার উত্তরে রাজ্যপাল বলে সুপ্রসিদ্ধ, অসমসাহসী যতীন্দ্রনাথ এই বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এছাড়াও বাংলার আরও অনেক নেতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে গিয়ে দেশের মুক্তির চেষ্টা করছে। এই কথা শুনে টেগার্ড শীঘ্র বিপ্লবীদের উৎখাত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য – এই দৃশ্যে পুনরায় যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেণ ও জ্যোতিষের কথোপকথন শোনা যায়। অস্ত্রে ভর্তি জাহাজ শত্রুদের হস্তগত হওয়ায় যতীন্দ্র বিলাপ করেন যে, সমস্ত চেষ্টা বিফল হল, স্বাধীনতার জন্য সাধিত সব সংকল্প ব্যর্থ হল। তখন চিত্তপ্রিয় বলেন, জগতের মঙ্গলের জন্য যা কিছু করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয়নি বরং তা স্বাধীনতার বীজস্বরূপ। যতীন্দ্র এর উত্তরে বলেন, এখন তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। মনোরঞ্জন আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ করলে তারা জয় লাভ করবে না। যতীন্দ্র বলেন জয় না পেলেও তারা মরতে পারবে নিশ্চিত। নীরেণ জানতে চান মরার ফল কি হবে? উত্তরে যতীন্দ্র বলেন, তাঁদের মৃত্যুতে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। দেশমাতার মুক্তিতে

তাঁরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবে মুক্তি নিশ্চিত হবে। গমনে, ভাষণে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে দাসত্ব বৃত্তি গ্রহণ করার চেয়ে মৃত্যু অনেক বরণীয়। তাই শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তাঁরা লড়াই করবে। বাকি সকলেই তাঁর মতকে সমর্থন করে।

চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য – টেগার্ড নগরপালকে বলে অত্যাচারিত হয়েও বিপ্লবীরা কি করে বৃটিশ সাম্রাজ্য উৎখাতের স্বপ্ন দেখে? উত্তরে নগরপাল জানায় যে, তাদের অত্যাচারে লেশমাত্র শিথিলতা নেই তবুও পাষণ্ড বিপ্লবীরা কচ্ছপের মতো মরেও বেঁচে থাকছে। তারপর তিনি জানতে চান কে এই বিপ্লবীদের নেতা। উত্তরে টেগার্ড বলেন –

"যতীন্দ্র ইতি নামা যো মুখোপাধ্যায়বংশজঃ

নেতাসৌ দুষ্টকৃত্যানাং শত্রুণাং স সুকৌশলঃ।।"[37]

এরপর টেগার্ড নগরপালকে আদেশ দেন যে, সমস্ত দেশে বিপ্লবীদের দস্যু বলে ঘোষণা করতে এবং যে বা যারা বিপ্লবীদের সংবাদ এনে দেবে তারা পুরস্কৃত হবে।

পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য – একটি গ্রামের দৃশ্য। এক ঘোষক ঘোষণা করে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি জানিয়েছেন – কিছু জার্ম্মাণ দেশীয় ও বঙ্গদেশীয় দুর্বৃত্ত দস্যুগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ধনসম্পদ লুণ্ঠনে করতে গ্রামে প্রবেশ করেছে। অতএব সকলকে সাবধান করা হচ্ছে। আর কেউ যদি এই দস্যুদের ধরতে সক্ষম

[37] বা. ম., পৃ. ১৬

হন তবে বৃটিশ সরকার তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে পুরস্কৃত করবে। এই ঘোষণা শুনে দুজন গ্রামবাসী বলতে থাকেন যে এই প্রজাপালক সরকার না থাকলে তাদের কে দেখতো। তারপর সকলে দস্যুদের খুঁজতে শুরু করে। যতীন্দ্র গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারা দস্যু নয়, বিপ্লবী। কিন্তু গ্রামবাসীরা কিছুতেই না বুঝলে যতীন্দ্ররা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গোলক নিক্ষেপ করে সেই স্থান থেকে পালায়।

পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য – এই দৃশ্যেই নাটকের চরম পরিণতি। সম্পূর্ণ দৃশ্য জুড়ে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে বাঘাযতীন ও তার চার সঙ্গীর যুদ্ধের বর্ণনা। যতীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীদের বলেন আজ তাঁদের শেষ যুদ্ধ। তাঁদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুধা, তৃষ্ণা বর্জন করেও তাঁরা যুদ্ধ করবে। তাঁরা মরবেই এই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কিন্তু একজনের জীবনের বিনিময়ে অন্ততপক্ষে দুজন শত্রুর জীবন নেবে। গ্রামবাসীরা টেগার্ডকে বিপ্লবীদের অবস্থান জানিয়ে দিলে শুরু হয় টেগার্ড বাহিনীর সঙ্গে বাঘাযতীনের লড়াই। যুদ্ধ চলাকালীন চিত্তপ্রিয় নিহত হন। টেগার্ডের গুলির আঘাতে যতীন্দ্র আহত হয়ে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন, আর মনোরঞ্জনকে বলেন, আজ তাঁর জীবন সার্থক হল কেননা, জননীর পূজা করতে আজ তিনি জননীর গৃহে যাচ্ছেন –

“জনন্যাঃ পূজনং কুর্ব্বন্ চলামি জননীগৃহম্।
আনন্দো ভবিতা কোঽস্মাৎ সার্থকং জীবনং মম।।”[38]

[38] বা. ম., পৃ. ২৩

নিজের দেশের মানুষেরাই তাঁর বিপ্লব বুঝলেন না, তাই হতাশা নিয়ে তিনি বললেন, এই ঘরের শত্রু বিভীষণেরা নিজেদের মাতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। তাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারলেই সুপুত্রগণের সঙ্গে পুনরায় শোভিত হবে ভারতবর্ষ। যতীন্দ্রনাথের এই উক্তির মাধ্যমেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

পঞ্চবীরের বালেশ্বর-যুদ্ধ

যুদ্ধের বর্ণনা করা এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি আলোচ্য নাটকটির প্রেক্ষাপট যেহেতু বালেশ্বরের যুদ্ধ তাই সংক্ষেপে সেই যুদ্ধের ইতিহাসের উপর একটু আলোকপাত করা হচ্ছে এই অধ্যায়ে। যুদ্ধ হয়েছিল ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল ছয় মাস আগে থেকেই। যতীন্দ্রনাথ ওরফে বাঘাযতীন ও তাঁর চার সঙ্গী (মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয়, নীরেণ ও জ্যোতিষ) থাকতেন বালেশ্বরে কাপ্তিপোদার কাছেই মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে। সেখান থেকে এক মাইল দূরে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় ও মনোরঞ্জন একটি গোপন আস্তানা গড়েন বিদেশ থেকে অস্ত্র আসবে বলে। আর সেখান থেকে আরও কিছুটা দূরে আস্তানা বেঁধেছিলেন নীরেণ ও জ্যোতিষ। তাঁরা সেখানে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেছিলেন। বাঘাযতীন ও তাঁর সঙ্গীরা অনেকাংশে নির্ভর করছিলেন ‘ম্যাভেরিক’ জাহাজের উপর। কিন্তু সেই ম্যাভেরিক কেন এল না শেষ পর্যন্ত, তা বেশ রহস্যাবৃত। পরে জানা যায় যে, শত্রুপক্ষ সব জানতে পেরে অস্ত্রসমূহ আত্মসাৎ করেছিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯১৫ এর মাঝরাতে বালেশ্বরে এসে উপস্থিত হন চার্লস অগাস্টাস টেগার্ডের পুলিশ বাহিনী। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা সেই খবর পেলেন ৬ই সেপ্টেম্বর। সেদিন মাঝরাতেই তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। পরের দিন সকালেই পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলে বিপ্লবীদের আস্তানা, কিন্তু সেখান থেকে কোন তথ্য পেলনা পুলিশ। ৮ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বর ও চারপাশের গ্রামে রটানো

হল যে, জার্মাণ দেশ থেকে ডাকাতেরা এসেছে লুঠ করতে। সবাই যেন সতর্ক থাকে। আর তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারলে গ্রামবাসীদের পুরস্কৃত করবে ইংরেজ সরকার। যুদ্ধের দিন অর্থাৎ ৯ই সেপ্টেম্বর ছিল সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। প্লাবিত হয়েছিল বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদী। যতীন্দ্রনাথেরা নদী পার হতে চাইলে মাঝিরা নিয়ে যেতে চাইলেন না। মাঝিরা তাঁদেরকে ডাকাত বলে সন্দেহ করল। অতঃপর একজন মাঝি রাজি হন তাঁদের পার করে দিতে। নৌকা থেকে নেমে তাঁরা চললেন দুর্গম জঙ্গলের অভিমুখে। এই সমস্ত ঘটনা মাঝি দফাদার কে জানায়। চোখে তখন তার পুরস্কারের লোলুপতা। তারপর উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তাঁদের ঘিরে ফেলে। যতীন্দ্রনাথ ও তার সঙ্গীরা তাদের অনেক চেষ্টা করেও বোঝাতে না পেরে পিস্তল চালাতে বাধ্য হন। সেই ভয়ে গ্রামবাসীরা ছত্রভঙ্গ হয়। কয়েক জন গ্রামবাসী পুলিশ সুপারকে সব বৃত্তান্ত জানায়। এদিকে বিপ্লবীরা একটু দূরে এক জায়গায় পৌঁছে বিপদের আশঙ্কা কম ভেবে অবসন্ন শরীরে ঘুমিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সেই স্থান পুলিশ অবরোধ করে গুলি চালাতে থাকে। গুলির শব্দে যতীন্দ্রনাথেরা সচেতন হন, তারপর শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে অনড় যুদ্ধ। বিপ্লবীদের অমোঘ নিশানায় পুলিশ বাহিনীর কয়েক জনের মৃত্যু হয় কিন্তু চিত্তপ্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। পুলিশ সুপার টেগার্ডের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন যতীন্দ্রনাথ। তবুও তিনি আহত শরীরে লড়াইয়ে অবিচল থেকেছেন। এই যুদ্ধে জয়ী হয় ইংরেজ সরকার। যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পরের দিন তাঁর মৃত্যু হয়। মনোরঞ্জন, নীরেণ ও জ্যোতিপ্রিয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্‌- ঐতিহাসিক মূল্য

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন বাঙালী তরুণ বিপ্লবী দল। যাঁরা নিজেদের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে আমাদের মুক্তির আস্বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমরা তাঁদের আদর্শকে প্রায় ভুলতেই বসেছি। যাঁদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের ফলে দেশে মুক্তির পথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁরা প্রত্যেকেই বরেণ্য। তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম প্রসিদ্ধ নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বালেশ্বরে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে মহাসমরে চারজন যোদ্ধার সহিত বাঘাযতীন পরাভূত হন। তার মৃত্যু হয় পরের দিন। কিন্তু তার সঠিক মূল্যায়ন কখনই হয়নি। তিনি যেন উপেক্ষিতই রয়ে গেছেন অনেকাংশে। এই বালেশ্বরের যুদ্ধকে আশ্রয় করেই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি রচনা করেন কবি নিত্যানন্দ। একটি নাটক যখন রচনা হয় তখন সেটি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপন করে। নাটকটির প্রেক্ষাপট যেহেতু স্বাধীনতা যুদ্ধ তাই কবিকে ইতিহাস রক্ষায় তৎপর হতে হয়েছে। আর কবি এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। যুদ্ধ হয়েছিল ১৯১৫ সালে, আর নাটকটি রচনা হয়েছে ১৯৮৭ সালে অর্থাৎ ৭২ বছর পরে। এতেই প্রমাণ হয় যে সংস্কৃত প্রেমীরা স্বাধীনতা আন্দোলনে কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নিত্যানন্দের জন্ম পরাধীন ভারতে, তাই মুক্তির স্বাদ যে কি তা তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন । দেশের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধাই কবিকে এই নাটক রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। সম্পূর্ণ নাটকটি ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর। কবি তাঁর লেখনীর স্পর্শে প্রত্যেকটি চরিত্র কে জীবন্ত করে তুলেছেন পাঠকের সামনে।

নাটকটিতে আমরা দেখি ইংরেজ শাসকরা বাংলার বিপ্লবীদের উপর কি অমানবিক অত্যাচার করেছে-

“আকৃষ্য জিহ্বা নহি নাশিতা সা

পাদৌ চ খঞ্জৌ ন কৃতৌ কথং বা।

মুণ্ডং চূর্ণং ন কৃতং পশূনাং

কিং বা কৃতং ভোঃ করণে নিযুক্তৈঃ।।”[39]

এর মধ্যে দিয়ে প্রথমতঃ তাঁদের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় সামনে আসে। আর দ্বিতীয়তঃ বোঝা যায় যে বাংলার বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য কতটা সচেষ্ট ছিলেন। প্রভাবশালী হয়েও ইংরেজরা বিপ্লবীদের কার্যকলাপে ভীত হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের বীরত্বকে তাঁরা অকপটে স্বীকার করেছেন।

“যতীন্দ্র ইতি নামা যো মুখোপাধ্যায়বংশজঃ।

নেতাসৌ দুষ্টকৃত্যানাং শত্রুণাং স সুকৌশলঃ।।”[40]

এছাড়াও দেখা যায় গ্রাম বাংলার অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনগণের ইংরেজ সরকারের উপর অন্ধবিশ্বাস। ইংরেজরা বিপ্লবীদের ধরার জন্য এই মূর্খ গ্রামবাসীদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের ব্যবহার করেছেন। আর পুরষ্কারের লোভে গ্রামবাসীরা বিপ্লবীদের খবর ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এই অসন্তোষ নিয়েই বাঘাযতীন কে চলে যেতে হল। তাই মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে তিনি বলে গেলেন-

---

[39] বা.ম., পৃ. ১৬

[40] তদেব

"ইমে বিভীষণা যাবৎ তিষ্ঠেয়ুশ্চাত্র ভারতে।

তাবন্মুক্তির্জনন্যা নো ন কদাপি ভবিষ্যতি।।"[41]

এই নাটকে সর্বাধিক ভাবে পাই বিপ্লবীদের কঠোর মনোভাব, অদম্য মানসিকতা, দেশজননীর মুক্তির জন্য তীব্র আকুলতা। বাঘাযতীন ও তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তবুও তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও লড়াই করেছেন। নির্ভীক চিত্তে বলেছেন যে তাঁদের মৃত্যুতে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। তাঁদের এই লড়াই ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে যাবে। সবসময় দেশকে জননী বলে সম্বোধন করেছেন তাঁরা। সুসন্তান যেমন যে কোন কিছুর বিনিময়ে জননী কে আগলে রাখে, ঠিক তেমনি বাংলার বিপ্লবীরাও আপন প্রাণের বিনিময়ে দেশজননীর শরীরে একটুও আঁচ লাগতে দিতে নারাজ ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন স্বাধীনতা বিহীন জীবন যাপনের চেয়ে মরণ অনেক শ্রেয়। ইংরেজ সরকার তাদের চলন, বলন, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবকিছুকেই নষ্ট করেছে-

"গমনে ভাষণে চৈব শিক্ষায়াং সংস্কৃতৌ তথা।

দাসবচ্চলিতব্যং চেৎ জীবনেন ফলং কিমু ।।"[42]

বিপ্লবী বাঘাযতীন সম্পর্কে লিখতে শুরু করলে তা আর শেষ হওয়ার নয়। বাল্যাবস্থা থেকেই তিনি ছিলেন অসম সাহসী ও অত্যন্ত মেধাবী। পাশাপাশি তাঁর

---

[41] বা.ম., পৃ. ২১

[42] তত্রৈব, পৃ. ১৪

ছিল শরীরচর্চায় গভীর আগ্রহ। যতীন্দ্রনাথ সাহস ও শৌর্যের জন্মলব্ধ অধিকারী ছিলেন। বাঘ মারার জন্যেই তাঁর এই বাঘাযতীন নামকরণ, একথা আমাদের সকলেরই জানা। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত অর্থ ও অস্ত্রের। ডাকাতি করেই বিপ্লবীরা তা সংগ্রহ করতেন। ১৯০৫- এর বঙ্গভঙ্গ যেন বিপ্লবীদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। প্রতিবাদে উত্তাল হয় সমগ্র ভারতবর্ষ, শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। ঠিক তার আগেই তাঁরা দেখেছেন কিভাবে চিনে আমেরিকার পণ্য বয়কট আন্দোলন সফল হয়। সেই দৃষ্টান্তে বাংলাতেও শুরু হয় ঐতিহাসিক বয়কট আন্দোলন। এছাড়াও বিপ্লবীরা দেখলেন কিভাবে রুশ-জাপানের যুদ্ধে জাপানের হাতে রাশিয়া পর্যুদস্ত হয়। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে বাংলার যুব শক্তি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাপানকে দেখে যেমন উদ্দীপিত হয় তরুণ দল, ঠিক তেমনি স্বদেশের মহারাষ্ট্রও তাদের নবীন প্রেরণা যোগায়। ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শিবাজীর স্বাধীনতার যুদ্ধ, কলকাতায় শিবাজী উৎসবে বালগঙ্গাধর তিলকের বক্তৃতা-

এই সবই বাংলার যুবশক্তির মনে স্বাধীনতার প্রেরণা জুগিয়েছে। কাল ক্রমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা (১৯১৪) হলে সমগ্র ভারতের বিপ্লবী দল স্বাধীনতা লাভের আশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। চলতে থাকে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি। তারপর ঠিক হয় জার্মান প্রতিনিধির মাধ্যমে শ্যামদেশ (অধুনা থাইল্যাণ্ড) থেকে অস্ত্র আসবে ম্যাভারিক জাহাজে করে। এই সমস্ত বিষয় নিত্যানন্দ সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে-

“জার্ম্মাণ-প্রতিনিধিমাধ্যমেন শ্যামদেশাৎ ম্যভারিকনামকযানেন অস্ত্রাগমনস্য বার্তা আসীৎ। কিন্তু নির্দিষ্টদিনমতিক্রান্তম্, অধুনাপি কোঽপি সংবাদো নাস্তি। এতনৈব মহান্ উদ্বেগোঽনুভূয়তে।”[43]

১লা জুলাই (১৯১৫)-এর মধ্যে বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ম্যাভেরিক পৌঁছলো না। ইংরেজ সরকার গুপ্তচরের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য জেনে জাহাজটিকে আটকে দেয়। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা জানতেন যে যুদ্ধে তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত তবুও তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন যে, সমস্ত ভয় কে জয় করে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করবেন। দেশের মুক্তির কামনায়

শরীরের শেষ রক্তবিন্দুও মাতৃভূমির চরণে অর্পণ করবেন-

“দেশমাতুর্বিমুক্ত্যর্থং শেষরক্তকণেন হি।

মাতরং তর্পয়িষ্যামঃ বয়ং চ ভক্তিমানসাঃ।।”[44]

নাটকটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। বাংলার বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের জন্যই আজ স্বাধীন ভারতের সূর্যোদয় দেখছি। ত্যাগ, দেশাত্মবোধ, আত্মমর্যাদা - এই সমস্তই যতীন্দ্রনাথের মধ্যে সগৌরবে বিকশিত হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের এই সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যে কতটা প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ আমরা এই নাটকে তাঁর বলা একটি উক্তির মাধ্যমে পাই-

---

[43] বা.ম., পৃ. ৮

[44] তত্রৈব, পৃ. ২০

"অস্মাকং মরণমবলোক্য অন্যেহপি মরণে উদ্দীপনাং লভেরন্।"[45]

তাঁর এই উক্তি সত্যিই যেন বেদবাক্য। এমন আরও অজস্র সংগ্রাম ও বিপ্লবীদের নির্ভিক চিত্তে আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়েই আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি। ইতিহাসের পাতায় আমরা বাঘাযতীনের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কথা জেনেছি কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এমন সাবলীল ভঙ্গীতে বাংলার গৌরব বাঘাযতীনকে নিয়ে নাটক রচনা করে কবি নিত্যানন্দ তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে ঐতিহাসিক নাটকের তালিকায় অন্যতম স্থানে চির বিরাজমান থাকবে '*বালেশ্বর-মহাযুদ্ধম্*' নাটকটি।

নাটকে উপস্থাপিত চরিত্ররাজির বর্ণনা

১. যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন)

আজকের এই ভোগসর্বস্ব জীবনে বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের কথা মানুষ প্রায় ভুলতেই বসেছে, তবুও বিপ্লবীদের নামোচ্চারণে এখনও আমরা শিহরিত হই। আলোচ্য নাটকের মুখ্য চরিত্র বাঘাযতীন। পরাধীন ভারতের মুক্তি সাধনায় ব্রতী মানুষদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম সতত উজ্জ্বল ছিল, আছে এবং থাকবে। সমগ্র নাটকজুড়ে আমরা তাঁর দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় পাই। দেশমাতার মুক্তির জন্য তাঁর আকুলতা নাটকটির প্রতিটি পরতে পরতে অনুভূত হয়। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে দেশমাতার মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বীরবিক্রমে লড়াই করেছেন-

[45] বা.ম., পৃ. ১৪

"শাষণাচ্ছোষণাত্তাবদত্যাচারিবিদেশিনাম্।

রক্ষণীয়া জনন্যেব যেন কেনাপ্যুপায়তঃ।।"[46]

ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাংলার বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর দল' - এর প্রধান নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জার্মান থেকে অস্ত্র আনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রগামী।

আত্মসংযম তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। সম্পূর্ণ নাটকটিতে আমরা দেখি তিনি তাঁর সঙ্গীদের উদ্দীপিত করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে না যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছেন-

"ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া সর্বে কাতরা যদি ভো বয়ম্।

তথাপি তৎ সমুৎসৃজ্য যুদ্ধং কুর্মস্তু শাসকৈঃ।।"[47]

ইংরেজ বাহিনীর কাছে তাঁদের মৃত্যু আসন্ন জেনেও যুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প থেকেছেন। সদর্পে বলেছেন একজন বিপ্লবীর জীবনের বিনিময়ে অন্ততপক্ষে দুজন শত্রুর প্রাণ নিতেই হবে-

"বয়ং সর্বে অবশ্যমেব মরিষ্যামঃ, তত্র নাস্তি কশ্চিৎ সংশয়াবকাশঃ। কিন্তু বয়ন্তু প্রত্যেকস্য জীবনবিনিময়েন ন্যূনতয়া শত্রূণাং জীবনদ্বয়ং গ্রহীষ্যামঃ।"[48]

---

[46] বা.ম., পৃ. ৪

[47] তত্রৈব, পৃ. ২১

[48] তদেব

২. চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী

ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম বিপ্লবী। চিত্তপ্রিয় বাঘাযতীনের নেতৃত্বে বালেশ্বরের যুদ্ধে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধে শহীদ হন। নাটকে বার বার আমরা দেখি দেশের মুক্তির জন্য চিত্তপ্রিয়ের ব্যাকুলতা-

> "বাধা গতা স্যাদ্ ভুবি পুণ্যকার্যে
>
> তস্যাঃ সমুল্লঙ্ঘ্য ইহৈব কার্যঃ।
>
> কার্যস্য সিদ্ধৈ যদি চাত্মনাশো
>
> ভবেৎ তথাসৌ শিরস্যৈব ধার্যঃ।।"[49]

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যদি সমস্ত দেশবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবেই দেশের মুক্তি সুনিশ্চিত হবে। ইংরেজদের অত্যাচারে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে অন্ন ও জলের জন্য যে হাহাকার তা চিত্তপ্রিয় কে পীড়িত করেছে। প্রাণের বিনিময়েও যুদ্ধ করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন তিনি। বুড়িবালামের যুদ্ধকে যতদিন মানুষ স্মরণে রাখবে ততদিন বাঘাযতীনের সঙ্গে তাঁর যোগ্য সহযোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় বর্ণময় হয়ে থাকবেন শহীদ বিপ্লবী চিত্তপ্রিয়।

৩. নীরেণ দাশগুপ্ত

বুড়িবালামের যুদ্ধের আর একজন সহকারী বিপ্লবী নীরেণ দাশগুপ্ত। ক্ষুদ্রায়তন নাটকের স্বল্প পরিসরে তাঁর চরিত্রের সার্বিক দিক বর্ণিত হয়নি তবুও কবির বর্ণনায় দেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে-

---

[49] বা.ম., পৃ. ৪

"যাবৎ ভীতিঃ সমায়াতু ন বিভীমঃ কথঞ্চন।

ভয়ং সর্বং বিজিত্যেব যুদ্ধং কুর্মো মহারণে।।"[50]

জানা যায় যে এই যুদ্ধের পর বিচারে নীরেণের ফাঁসি হয়।

এছাড়াও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল ছিলেন এই যুদ্ধে বাঘযতীনের সহকারী যোদ্ধা। এদের প্রত্যেকের দেশপ্রীতি অতুলনীয়, অবর্ণনীয়। যুদ্ধের পর বিচারে মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয় এবং জ্যোতিষের কারাদণ্ড হয়। জেলের অমানবিক অত্যাচারে জ্যোতিষ পাল উন্মাদ হয়ে মারা যান।

নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় নামে আর এক বিপ্লবী চরিত্রের উপস্থিতি আমরা দেখি। আর এই অঙ্কেই যতীন্দ্রনাথের মুখে আত্মারাম নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ পাই। সমগ্র নাটকে এই একটি অঙ্কেই মাত্র দুবার আমরা এই নামটি শুনি। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে আত্মারাম ছিলেন গদর দলের অন্যতম সদস্য। জার্মানি থেকে অস্ত্র আনার ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা ইনিই করেছিলেন।

৪. **চার্লস অগাস্টাস টেগার্ড**

তৎকালীন ব্রিটিশ পুলিশের কমিশনার ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের কাছে ছিলেন ত্রাসস্বরূপ। বিপ্লবীদের উপর অমানবিক অত্যাচারে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর উক্তির মাধ্যমেই তাঁর চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়-

[50] বা.ম., পৃ. ২০

"চক্ষুরুৎপাটয়িষ্যামি তথা হস্তপদাদিকম্।

চূর্ণয়িষ্যামি তেষাং হি বুদ্ধিং লোপয়াম্যহম্।।"[51]

এছাড়াও তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী (H.H. Asquith), ভারত সচিব (Edwin Montagu), বঙ্গ রাজ্যপাল (Lord Hardinge) প্রমুখ চরিত্রের উপস্থিতিও আমরা নাটকে দেখি। এই সহকারী চরিত্রগুলি নাটকের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু চরিত্রগুলির সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা

এবারে আসি নাটকটির তাত্ত্বিক দিকের আলোচনায়। সংস্কৃত আলংকারিকেরা একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর পাশাপাশি তাঁরা এটাও বলেছেন যে নাটকে কোন বিষয়গুলি দেখানো যাবে না । এবিষয়ে কবিরাজ বিশ্বনাথ বলছেন-

"দুরাহ্বানাং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।

বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুং রতং তথা।।"[52]

অর্থাৎ দূর থেকে আহ্বান করা, মৃত্যু, যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব নাটকে দেখানো যাবে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য নাটকটির নামের মধ্যেই আমরা যুদ্ধের উল্লেখ পাই। তাই একথা বলতেই হয় যে, কবি নাট্যতত্ত্বের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনায়াসে উপেক্ষা

[51] বা.ম., পৃ. ১১

[52] সা.দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬

করেছেন এছাড়াও তিনি নাটকের শেষে নায়কের মৃত্যু দেখিয়েছেন যা প্রাচীন নাট্য পরম্পরার পরিপন্থী। নাটকটির শেষে যেহেতু নায়কের মৃত্যু হয় তাই এটি প্রকৃতপক্ষে ট্র্যাজিক নাটক। সংস্কৃত নাটকে একমাত্র ভাস বিরচিত '*উরুভঙ্গম্*' ব্যতীত আমরা সেই অর্থে কোন ট্র্যাজিক নাটক দেখতে পাই না। এই প্রসঙ্গে শেক্সপিয়ারের '*ওথেলো*', দিনবন্ধু মিত্রের '*নীলদর্পণ*' প্রভৃতি নাটকের নাম আমাদের স্মরণে আসে। ট্র্যাজেডির আলোচনা করতে গেলে পাশ্চাত্য আলংকারিক অ্যারিস্টটলের নামই সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে। তিনি বললেন-

"Tragedy, then is an imitation of an action that is serious complete and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornaments, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative; through pity and fear affecting the proper Purgation of these emotions."[53]

আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ নাটকের লক্ষণে বলেছেন-

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্"[54]

অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে পাঁচটি সন্ধি থাকবে। নাটকের এক এক 'অবস্থা'র সঙ্গে 'প্রকৃতি'র সম্বন্ধকে বলে 'সন্ধি'। 'অবস্থা' আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম ভেদে পাঁচ প্রকার। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ হল কারণ বা হেতু। 'অর্থপ্রকৃতি' শব্দের অর্থ হল- নাটকের প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির হেতু বা কারণ সমূহ। বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য ভেদে পাঁচ প্রকার অর্থপ্রকৃতির বিভেদ স্বীকার

[53] *Aristotle's Poetics*, p. 23
[54] সা.দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩

করেছেন সাহিত্য সমালোচকেরা। বর্তমানে নাট্যকারেরা প্রাচীন ঐতিহ্যের বেড়া ভেঙে স্বচ্ছন্দে নাটকে অভিনবত্ব এনেছেন। আবার কোথাও কোথাও ঐতিহ্যকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুসরণ করেছেন। আলোচ্য নাটকে কবি নিত্যানন্দ অনেকাংশে স্বকীয় অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। এবার আসি প্রথম প্রকার অর্থপ্রকৃতি অর্থাৎ বীজের আলোচনায়। নাটকে কোন ঘটনা প্রথমে স্বল্প ভাবে প্রদর্শিত হয়ে পরে নানা প্রকার অপ্রধান ঘটনার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে যখন নাটকের মুখ্য ফল লাভের কারণ হয়, তখন তাকে নাটকীয় পরিভাষায় 'বীজ' বলে। বৃক্ষের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকেই এরূপ নামকরণ হয়েছে বলে '*দশরূপক*'- এর টীকাকার ধনিকের মত। '*বালেশ্বর-মহাযুদ্ধম্*' নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যতীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি হল নাটকের বীজ-

"শাষণাচ্ছোষণাত্তাবদত্যাচারিবিদেশিনাম্।

রক্ষণীয়া জনন্যেব যেন কেনাপ্যুপায়তঃ।।"[55]

অত্যাচারী বিদেশীদের শাসনের কবল থেকে যেকোনো উপায়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করাই এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অংশটিই আবার আরম্ভ নামক অবস্থা। কারণ এখানে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে নায়কের ঔৎসুক্য দেখা যাচ্ছে । আর আরম্ভ ও বীজের সহাবস্থান হওয়ায় এটিই 'মুখসন্ধি'।

ক্ষুদ্রকায় নাটকটিতে বিন্দু, পতাকা ও প্রকরীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের প্রারম্ভ হয় তার পরিণতি অন্তিমে অবশ্যই থাকে। নাটকে

[55] বা.ম., পৃ. ৪

যে বস্তু আকাঙ্ক্ষিত, যে বস্তু সাধ্য অর্থাৎ প্রধানরূপে নাটকে বর্ণনীয়, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাটকের আরম্ভ হয়েছে তা সিদ্ধ হলেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকেই বলে 'কার্য্য'। আলোচ্য নাটকে যে কোন উপায়ে বৈদেশিক শাসনের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, আর সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতেই যতীন্দ্রনাথ অর্থাৎ নাটকের নায়ক শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথিত নিম্নে লিখিত উক্তিটিই 'কার্য্য'।–

"জনন্যা পূজনং কুর্ব্বন্ চলামি জননীগৃহম্।
আনন্দো ভবিতা কোঽস্মাৎ সার্থকং জীবনং মম।।"[56]

করুণরস সিক্ত *বালেশ্বর-মহাযুদ্ধম্*

কাব্যতত্ত্বে 'রস' হল বিবিধ অনুভূতির উদ্রেকে সৃষ্ট অনির্বচনীয় আনন্দবিশেষ। লৌকিক জগৎ ও জীবনকে আশ্রয় করেই কাব্যের সৃষ্টি হয়। আর কবি তাঁর প্রতিভাগুণে এই লৌকিক ঘটনাকে অলৌকিকতায় উত্তীর্ণ করেন। এই অলৌকিকতাই রসের উদ্রেক ঘটায়। 'রস্' ধাতু থেকেই 'রস' শব্দের নিষ্পত্তি, যার অর্থ হল আস্বাদন করা। সহৃদয় চিত্তে আস্বাদ্যমানতার জন্যই রসের এরূপ নামকরণ। *'নাট্যশাস্ত্র'*- এর রসবিমর্শে বলা হয়েছে-

'রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ'[57]

---

[56] বা. ম., পৃ. ২৩

[57] না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৭

দর্পণকারের মতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশক, আনন্দচিন্ময়, অন্যান্য জ্ঞেয়বিষয়ের স্পর্শলেশশূন্য ও ব্রহ্মাস্বাদতুল্য-

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ

বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।।

লোকোত্তরচমৎকার-প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ

স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ।।"[58]

নাটকের লক্ষণনির্ণয়াবসরে সাহিত্যদর্পণে উক্ত হয়েছে-

'এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।'[59]

অর্থাৎ নাটকে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত রসই অঙ্গী বা প্রধান রস হবে কিন্তু আলোচ্য নাটকের অঙ্গী রস করুণ। কারণ নাটকের শেষে নায়কের মৃত্যু প্রদর্শিত হয়েছে। করুণরসের স্থায়ীভাব হল 'শোক'। শোক ইষ্টজনের বিনাশের ফলে অথবা অনিষ্টপ্রাপ্তিতে উৎপন্ন হতে পারে। এই শোক নামক স্থায়ীভাবই করুণরসে পর্যবসিত হয়। *'নাট্যশাস্ত্র'*-এ বলা হয়েছে-

'অথ করুণো নাম শোকস্থায়িভাবপ্রভবঃ।'[60]

রাগ, অশ্রু, নিশ্বাস, মুখের শুষ্কভাব, রোদন, প্রলাপ, পরিবেদন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা করুণরস অভিনেয়। নির্বেদ, গ্লানি, জড়তা, বিষাদ, উন্মাদ, অপস্মার, উচ্ছ্বাস,

---

58 সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৮৯

59 তত্রৈব., পৃ. ৩৬৮

60না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৫

মোহ, বেপথু প্রভৃতি প্রায় সর্ববিধ দুঃখাত্মক ব্যভিচারিভাব করুণ রসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'- এ এই রসের স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"ইষ্টবধদর্শনাদ্বা বিপ্রিয়বচনস্য সংশ্রবাদ্বাপি।

এভির্ভাববিশেষৈঃ করুণরসো নাম সম্ভবতি।।

সস্বনরুদিতৈর্মোহাগমৈশ্চ পরিদেবিতৈর্বিলোপিতৈশ্চ।

অভিনেয়ঃ করুণরসো দেহায়াসাভিঘাতৈশ্চ।।"[61]

দর্পণকার বিশ্বনাথও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে করুণরসের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। আমাদের আলোচ্য নাটকে নায়ক যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে জাত শোকই করুণরসের উদ্রেক করেছে। শোচ্য বিষয় অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুই হল এখানে আলম্বন বিভাব। দেশজননীর মুক্তি সাধনে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বিলাপ করাই হল অনুভাব, আর নায়কের মৃত্যুতে যে চির বিষাদের সুর ঘনীভূত হয়েছে তাই হল ব্যভিচারিভাব। এই ত্রিবিধ ভাবের সঙ্গে শোকের সংযোগে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে উদ্ধৃত নাটকের অংশটির উল্লেখ করা যেতে পারে-

"মাতাঃ! দেশজননি! ন পারয়ামি তে মুক্তিং সাধয়িতুম্। জীবনমিদং ব্যর্থমভবৎ। সর্বা চেষ্টৈব বিফলতামুপগতা।"[62]

---

[61] না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৬

[62] বা. ম., পৃ. ২৩

এখন প্রশ্ন জাগে রসমাত্রই তা আনন্দদায়ক, তবে করুণ রসের রসত্ব কি ভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের নিরসন করেছেন সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ-

"করুণদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।।"[63]

করুণাদি রস থেকে যে পরম সুখোপলব্ধি হয় তার একমাত্র প্রমাণ হল সহৃদয় সামাজিকের অনুভব। তাছাড়া আমরা যদি করুণ রসের রসত্ব স্বীকার না করি তবে করুণ রস প্রধান রামায়ণাদি কাব্যের রসত্বের হানি হয়। অথচ করুণ রসাত্মক কাব্য পাঠে বা শ্রবণে সহৃদয়ের গভীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক জগতের যে সমস্ত ঘটনাবলী দুঃখের কারণ হয়, সেই সমস্ত ঘটনাই যখন আবার কাব্য বা নাটকে বর্ণিত হয় তখন তা অলৌকিক আনন্দের জন্ম দেয়। তাই দুঃখজনক হওয়া সত্ত্বেও আনন্দ প্রাপ্তি থেকে করুণ রসের রসত্ব সিদ্ধ হয়। এই করুণ রসের বর্ণনায় মহাকবি ভবভূতি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানব হৃদয়ের যে বেদনা '*উত্তররামচরিতম্*' নাটকে চিত্রিত হয়েছে তা অনবদ্য। অর্বাচীন আলংকারিক অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র নাটকের অঙ্গীরস প্রসঙ্গে করুণ রসেরও উল্লেখ করেছেন-

'শৃঙ্গারঃ করুণো বীরশ্শান্তো বাঙ্গী রসো ভবেৎ'[64]

করুণ রস ব্যতীত *'বালেশ্বর-মহাযুদ্ধম্'* নাটকে অঙ্গরস হিসেবে বীর ও রৌদ্র রসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

---

[63] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৯৬

[64] *অভিরাজযশোভূষণম্*, পৃ. ২০০

"ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া সর্বে কাতরা যদি ভো বয়ম্।

তথাপি তৎ সমুৎসৃজ্য যুদ্ধং কুর্মস্তু শাসকৈঃ।।"[65]

যতীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বীর রসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বীর রস উত্তম প্রকৃতি ও উৎসাহ মূলক। প্রতাপ, বিনয় প্রভৃতির দ্বারা ভাবিত। করুণা, যুদ্ধ, দান প্রভৃতির দ্বারা অনুভবিত। গর্ব, ধৃতি, হর্ষ, অমর্ষ, স্মৃতি, মতি, বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা বিভাবিত হয়ে উৎসাহ নামক যে স্থায়ীভাব রসিকবর্গের দ্বারা আস্বাদিত হয় সেটাই বীররসে পর্যবসিত হয়। যুদ্ধপ্রধান নাটক হওয়ায় এই অংশটি যুদ্ধবীরের দৃষ্টান্ত।

'বালেশ্বর-মহাযুদ্ধম্' নাটকের তৃতীয়াঙ্কে প্রতিনায়ক টেগার্ডের উক্তিতে বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারের বর্ণনার মধ্যে রৌদ্ররসের অনুভূতি হয়-

"চক্ষুরুৎপাটয়িষ্যামি তথা হস্তপদাদিকম্।

চূর্ণয়িষ্যামি তেষাং হি বুদ্ধিং লোপয়াম্যহম্।।"[66]

এই অংশে বিপ্লবীদের প্রতি টেগার্ডের ক্রোধ রৌদ্র রসের উদ্রেক করেছে।

অলংকার প্রয়োগ

কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ অনিবার্য নয়। তবুও রসোপলব্ধির সহায়ক হিসেবে অলংকারের বহুল প্রয়োগ আমরা কাব্যে দেখতে পাই। শুধু কাব্যেই নয় সাধারণ মানুষ তাদের নিত্যদিনের ভাষায় অলংকারের প্রয়োগ অনায়াসে করে থাকে,

---

[65] বা. ম., পৃ. ২১

[66] তত্রৈব, পৃ. ১১

যেমন- সাতরাজার ধন মাণিক, বিদ্যার সাগর, মুখটি শুকিয়ে যেন আমচুর হয়ে গেছে- এমন শত শত উপমা, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগ লৌকিক বার্তায় প্রায়ই শোনা যায়। এই উক্তিগুলিই যখন সাহিত্যে প্রয়োগ হয় তখন তা হয় পারিভাষিক অর্থে 'অলংকার'। আচার্য ভামহ রচিত *'কাব্যালংকার'* অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে প্রাচীনতম অলংকার গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। ভামহ পরবর্তী আলংকারিকরূপে আমরা দণ্ডী-কে পাই। তাঁর মতে অলংকার কাব্যের শোভাবর্ধক ধর্ম-

"কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে"[67]

আলংকারিক বামনাচার্য অলংকার শব্দের দুপ্রকার ব্যুৎপত্তি করেছেন, তার একটি হল ভাববাচ্য নিষ্পন্ন অলংকার শব্দ, (অলংকৃতিরলংকারঃ)। অর্থাৎ অলংকরণই অলংকার, এবং দ্বিতীয়টি করণকারকে ব্যুৎপত্তি করে (অলংক্রিয়তে অনেন) নিষ্পন্ন অলংকার শব্দ। অর্থাৎ যার দ্বারা কাব্য অলংকৃত হয়, অর্থাৎ উপমা,রূপক ইত্যাদি। প্রথমটি সামান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা কাব্যের যে কোন শোভাকর ধর্মকে বোঝায়। দ্বিতীয়টি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ অর্থে। এর দ্বারা উপমা ইত্যাদি পারিভাষিক অলংকারকে বোঝায়।

আচার্য ভামহ বলেছেন, অলংকার বিহীন বনিতার আনন যেমন শোভা পায় না তেমন অলংকার বিহীন কাব্যও শোভনীয় হয় না-

'ন কান্তমপি নির্ভূষণং বিভাতি বনিতাননম্'[68]

---

[67] কা. দ., পৃ. ২১

[68] *কাব্যালঙ্কারঃ (ভামহ বিরচিত),* সম্পা. রমণকুমার শর্মা, পৃ. ৫

অলংকারের যথার্থ স্বরূপ ও সংখ্যা প্রসঙ্গে মতানৈক্য আছে। সাধারণভাবে অলংকার শব্দালংকার ও অর্থালংকার ভেদে দুপ্রকার। এছাড় শব্দার্থালংকার বা উভয়ালংকারও স্বীকৃত হয়েছে। শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষই প্রধান। কিন্তু অর্থালংকার সংখ্যায় অনেক। বোধসৌকর্যার্থে অর্থালংকারগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ক) সাদৃশ্যমূলক- উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, নিদর্শনা প্রভৃতি।

খ) বিরোধমূলক- বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি ইত্যাদি

গ) ন্যায়মূলক- অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান প্রভৃতি।

ঘ) গূঢ়ার্থপ্রতিতীমূলক- অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি ইত্যাদি।

আলোচ্য নাটকে শব্দালংকারের প্রাধান্য দেখা যায়। অনুপ্রাসের প্রয়োগের পাশাপাশি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার হিসেবে উপমা ও রূপক অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়া বিরোধমূলক বিশেষোক্তি অলংকারেরও প্রয়োগ করেছেন কবি।

নাটকে লক্ষিত অনুপ্রাসের প্রয়োগ

"মানহীনাদ্য মাতা হা ম্লেচ্ছশাসনমাগতা।

শোষিতা সর্বতো দেবী বর্জিতা ধনসম্পদা।।"[69]

এই শ্লোকের প্রথম চরণে ম,ন,হ বর্ণগুলির পুনরাবৃত্তিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

[69] বা.ম., পৃ. ৪

এছাড়া ‘দ্বেষাং দোষবিষয়ঃ’ এবং ‘এতদিচ্ছতঃ ইচ্ছতাং বা’ এই অংশগুলিতে অনুপ্রাসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

উপমা অলংকারের প্রয়োগ

“এবং কেচন মূর্খাঃ আত্মানং বিপ্লবীনং মন্যমানা পতঙ্গবৎ উড্ডীনাঃ বহ্নৌ স্বয়মেব দগ্ধা ভবন্তি”

অর্থাৎ কিছু মূর্খ ব্যক্তি নিজেদের বিপ্লবী মনে করে পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপিয়ে দগ্ধ হচ্ছে।

এই অংশটিতে ‘মূর্খ বিপ্লবী’রা হল উপমেয়, ‘পতঙ্গ’ উপমান, ‘বৎ’ ঔপম্যবাচী শব্দ এবং ‘বহ্নৌ স্বয়মেব দগ্ধা ভবন্তি’- সামান্যধর্ম। এই অংশে উপমা অলংকারের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় এখানে পূর্ণোপমা হয়েছে।

রূপকের প্রয়োগ

“স্মারামশ্চ তেষাং জন্মভূমিজননীচরণাম্বুজে সমর্পিতজীবনানাম্ আদর্শভূতানাং পুণ্যচরিতানাং পুণ্যজীবনম্”

পংক্তিটির ‘চরণাম্বুজে’ অংশটিতে রূপক অলংকারের প্রয়োগ দেখতে পাই। বিষয়ের অর্থাৎ উপমেয়ের অপহ্নব না করে তার উপর বিষয়ীর অর্থাৎ উপমানের অভেদ আরোপকে রূপক বলে। জননীর চরণদ্বয়কে অম্বুজ অর্থাৎ পদ্মের সাথে তুলনা করা হয়েছে। চরণদ্বয় এখানে উপমেয়, অম্বুজ উপমান। উপমেয়কে নিষেধ না করে উপমেয় চরণে উপমান অম্বুজের অভেদারোপে রূপক অলংকার হয়েছে।

বিশেষোক্তি অলংকারের প্রয়োগ

"পাপানাং বিলোয়োঽদ্যাপি পুত্রাণাং নাভবৎ কিমু।

সর্বা চেষ্টা যতো মাতঃ সিদ্ধিং নৈব প্রগচ্ছতি।।"[70]

এই শ্লোকে বিপ্লবীরা ইংরেজসাম্রাজ্য নাশের জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করেও সিদ্ধি লাভ করতে পারছেন না। অর্থাৎ বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা রূপ উপযুক্ত কারণের উপস্থিতি থাকলেও দেশস্বাধীন রূপ

কার্য্যের অভাব হওয়ায় এখানে বিশেষোক্তি অলংকার হয়েছে। অর্থাৎ কারণ থাকলেও যেখানে কার্য্যের অভাব থাকে সেখনে বিশেষোক্তি অলংকার হয়। এই অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন-

'সতি হেতৌ ফলাভাবঃ বিশেষোক্তিস্তথা দ্বিধা'[71]

বিশেষোক্তি অলংকার উক্তনিমিত্তক ও অনুক্তনিমিত্তক ভেদে দুপ্রকার। যেখানে কার্য্যাভাবের প্রযোজকরূপে কারণের উক্তি হয় সেখানে উক্তনিমিত্তক এবং যেখানে কারণের অনুক্তি সেখানে হয় অনুক্তনিমিত্তক। আমাদের আলোচ্য শ্লোকে কারণের উল্লেখ থাকায় এখানে উক্তনিমিত্তক বিশেষোক্তি অলংকার হয়েছে।

---

[70] বা.ম., পৃ. ৯

[71] সা.দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২২৭

ছন্দোবিচার

সমগ্র *‘বালেশ্বর-মহাযুদ্ধম্’* নাটকে ৫২টি শ্লোক আছে। তার মধ্যে ২৮টি শ্লোকে অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন কবি। বাকি শ্লোকগুলিতে মন্দাক্রান্তা, মালিনী, ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। নাটকের নান্দী শ্লোকটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে গ্রথিত। মন্দাক্রান্তার সুললিত বাঁধনে দেশজননীর স্তুতি সত্যিই আমাদের চিত্তে দোলা দেয়-

“যস্যাঃ ক্রোড়ে বসতিরিহ বৈ মানাবাং সুখায়।
খাদ্যং পেয়ন্ত্বমৃতসদৃশং শুদ্ধবস্ত্রং তথৈব।।
হৃষ্টা চাসৌ নিজসুতগুণে সন্দদাত্যত্র দেশো।”
পায়ান্মাতা নিখিলবিপদঃ সৈব যুষ্মান্ সদৈব।।”[72]

এছাড়া দেশমাতার প্রতি ভক্তিতে বিপ্লবীদের যে বীরত্ব ফুটে উঠেছে তা অপূর্ব দক্ষতায় অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। নাটকের পঞ্চমাঙ্কের একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে-

“মাতুঃ সেবাং প্রকুর্বন্তো ব্রজামো মরণং যদি।
স্বার্থকং মরণং তত্তু মরণং হি যতো ধ্রুবম্।।”[73]

---

[72] বা.ম., পৃ. ১
[73] তত্রৈব, পৃ. ২১

ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাস প্রোক্ত অনুষ্টুভ্ ছন্দের লক্ষণটি এখানে প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ শ্লোকের প্রতি চরণেই পঞ্চম বর্ণ লঘু এবং ষষ্ঠ বর্ণ গুরু এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু। অপর বর্ণগুলি সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই-

"পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।

গুরু ষষ্ঠঞ্চ পাদানাং শেষেষ্বনিয়মো মতঃ।।" [74]

গুণ-রীতি সমীক্ষা

সাধারণত নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার, করুণ ও শান্ত রস মাধুর্য্যগুণ বিশিষ্ট; রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রস ওজঃগুণ বিশিষ্ট এবং হাস্য, অদ্ভুত ও ভয়ানক রস প্রসাদগুণ মণ্ডিত হয়। আলোচ্য নাটকের অঙ্গী রস করুণ। অতএব নাটকটিকে মাধুর্য্যগুণ মণ্ডিত বলতে পারি। মাধুর্য্যগুণের সংজ্ঞায় আচার্য দণ্ডী বললেন-

"মধুরং রসবৎ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।

যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনৈব মধুব্রতাঃ।।"[75]

অর্থাৎ রসবিশিষ্ট বাক্যই মধুর বা বাক্যের রসবত্তাই হল মাধুর্য্যগুণ। সমাসবিহীন বা অল্পসমাস বিশিষ্ট মৃদুবর্ণঘটিত বাক্য করুণ রসের ব্যঞ্জক। নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ বিরচিত *'বালেশ্বর-মহাযুদ্ধম্'* নাটকের প্রতিটি শ্লোকে অল্পসমাস এবং মৃদু বর্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়-

"জয়তি জয়তি মাতা ভূমিরূপা সদৈব

---

[74] ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ১৮১

[75] কা.দ., পৃ. ১৩১

নিখিলসুখবিধাত্রী অন্নদাত্রী সদা নঃ।

বসতিমপি দদাতি ক্ষেমরূপা সুতানাং

বসনজলসুখদাত্রী তাঞ্চ দেবীং নমামি।।”[76]

আচার্য বামনের মতে মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্য গুণের সমাবেশে পাঞ্চালী রীতি হয়। অতএব মাধুর্য্যগুণের উপস্থিতি থাকায় বলা যেতে পারে নাটকটির রীতি পাঞ্চালী। রসভেদে গুণের বিভেদ স্বীকৃত হলেও নিত্যানন্দের রচনায় আমরা প্রসাদগুণেরও ব্যবহার লক্ষ্য করি। ভাষার সরলতাই নিত্যানন্দের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাব্য শ্রবণমাত্রই অর্থবোধ হলে প্রসাদগুণ হয়। আচার্য ভামহের মতে সকলের বোধগম্য অর্থই প্রসাদগুণবিশিষ্ট। কাব্য প্রসাদগুণোপেত হলে তার রস পাঠমাত্রেই সহৃদয়ের হৃদয়ঙ্গ হয়। উদাহরণ স্বরূপ নাটকটির একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হল-

“যুদ্ধং কুর্মো বয়ং সর্বে শত্রুভিঃ সর্বযত্নতঃ।

প্রাণাত্যয়েহপি যুদ্ধাত্তু যাস্যামো বিরতিং ন হি।।”[77]

---

[76] বা.ম., পৃ. ৪

[77] তত্রৈব, পৃ. ২০

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্– একটি সমীক্ষা

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্– একটি সমীক্ষা

নাটকটির বিষয়বস্তু

আমুখ

স্থান – দিল্লীর লালকেল্লার একটি ন্যায়ালয়। সেখানে বিনায়ক দামোদর সাভারকার এবং অন্য অভিযুক্তরা নিজ নিজ স্থানে বসে একে অপরের সঙ্গে সম্ভাষণরত। সাভারকারের বয়স ৬৫ বছর। তাঁর গায়ে একটি কালো রঙের কোট ও মাথায় বৃত্তাকার টুপি। এছাড়াও রয়েছেন দু-তিন জন অধিবক্তা। সকলে ন্যায়াধীশের জন্য অপেক্ষা করছেন। এরপর ন্যায়াধীশ মহাশয় এলে বিচারপর্ব শুরু হয়। তখন এক অভিযোজক বলেন গান্ধী হত্যার চক্রান্তে সাভারকার হত্যাকারীদের প্ররোচনা দিয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের দুই প্রধান অভিযুক্ত গোডসে ও আপটে উভয়ের সঙ্গে সাভারকারের দীর্ঘদিনের পরিচয়। সাভারকারের আজ্ঞা না পেলে তাঁরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটাতো না। বিরোধী পক্ষের অভিযেগের পর সাভারকার আত্মপক্ষ সমর্থন করে দৃপ্ত কণ্ঠে তাঁর উপরে আনা অভিযোগের বিরোধিতা করে বলেন গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতের অমিল থাকলেও তাঁদের মধ্যে স্নেহপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। তিনি বলেন, তাঁর জীবনে বাল্যকাল থেকে রাষ্ট্রোদ্ধার ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই কথার মধ্যে দিয়েই রঙ্গমঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে। আমুখের সমাপ্তি ঘটে।

প্রথমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য

স্থান – মহারাষ্ট্রের ভগুর গ্রামে সাভারকারের গৃহ। সময় – ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ। বাড়ির ভিতর থেকে দূর্গার স্তুতি শোনা যাচ্ছে। বাইরে ১৫ বছরের বালক বিনায়ক একটি পুস্তক পাঠে নিমগ্ন। এরপর বিনায়কের পিতা এসে দেখেন সে আরণ্যক পাঠ করছে। তাঁর পিতা তাকে বলেন বালক বয়সে

এই গ্রন্থ পাঠ করতে নেই। এটি অরণ্যে পাঠ করতে হয়। একথা শুনে বিনায়ক তাঁর পিতাকে বলেন স্বয়ং রামচন্দ্র তো বাল্যেই বনবাসে গিয়েছিলেন। এর উত্তরে তাঁর পিতা বলেন, ‘কোথায় রামচন্দ্র আর কোথায় আমাদের মত সাধারণ মানুষ’। একথা শুনে বিনায়ক আরণ্যক রেখে অন্য পুস্তক পড়তে আরম্ভ করেন। এমন সময় সেখানে ভিম্যা, রাজা, পরশা, রাণূ নামক বিনায়কের বন্ধুরা প্রবেশ করে। বিনায়কের লেখা নাটকে তারা অভিনয় করবে, সেই ব্যপারে আলোচনা করতে থাকে।

প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

স্থান – নাসিকে সাভারকারের গৃহ। সময় – ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ। বিনায়ক মিত্রমেলা সভার আসন সজ্জায় রত। বিনায়ক তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সভায় উপস্থিত থাকতে বলেন। কিন্তু তিনি প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে যান। এরপর একে একে সভার সদস্যরা এসে উপস্থিত হন। সাভারকারের বক্তব্যে সকলে উদ্দীপিত হয়। তিনি বলেন, তাঁরা ইংরেজনিষ্ঠ হয়ে থাকবেন না। স্বাধীনতার অম্লান দিব্যধ্বজা তাঁরা ওড়াবেই। এরপর বিনায়কের মামা তাঁর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন।

প্রথমাঙ্কে তৃতীয়াঙ্ক

এই দৃশ্যে সাভারকার ব্যারিস্টারী পড়তে ইংল্যণ্ডে যাচ্ছেন। তাঁর বন্ধুরা আসে তাঁকে বিদায় জানাতে। সাভারকার তাঁর বন্ধুদের বলেন তাঁর অবর্তমানেও যেন ‘অভিনব ভারত’ সমিতির কার্যকলাপে শিথিলতা না আসে। তারপর সেখানে বিনায়কের স্ত্রী তাঁদের এক বছরের পুত্র নিয়ে প্রবেশ করে। স্বামীর বিদেশযাত্রায় ব্যাথিতহৃদয়া স্ত্রী বলেন তাঁদের আর সংসার সুখ উপভোগ করা হল না। এর উত্তরে বিনায়ক বলেন, তিনি দেশের সংসার রচনায় উদ্যত হয়েছেন –

‘অহং তু দেশস্য সংসারং রচয়িতুম্ উদ্যতোঽস্মি।’[78]

দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য

সময় – ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ। স্থান – ইংল্যাণ্ডে সমুদ্রতীরস্থ ব্রায়টন শহর। নিরঞ্জন পাল ও সাভারকারের কথোপকথন। বিনায়ক নিরঞ্জনকে বলেন, ভারতীয় ছাত্র হওয়ার জন্য তাঁর বাড়ির মালিক তাঁকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। এরপর ওয়াইলি বধবৃত্তান্তের অন্যতম অভিযুক্ত মদনলাল ধিংড়াকে নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতে থাকে। বিনায়ক বলেন যদি এই রকম শতশত মদনলালকে পাওয়া যায়, তবে দেশের স্বাধীনতা লাভ সত্বর হবে। এমন সময় সেখানে আসে জ্ঞানচন্দ বর্মা। বিনায়ক তাঁকে ডেকেছেন মদনলালের মৌলিক আবেদনকে লিখিত আকারে প্রকাশ করার জন্য।

দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

নিরঞ্জন ও সাভারকারের বার্তালাপ চলতে থাকে সমুদ্রতীরে। বিনায়ক জানায় যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবা রায়কে ব্রিটিশরা আন্দামানে নির্বাসিত করেছে। তাই ভ্রাতৃজায়া, পত্নী ও পুত্রের জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সে ভারতে ফিরতে চায় কিন্তু দুই দেশের মাঝে এই বিস্তীর্ণ সাগর তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে সমুদ্রকে অভিশাপ দেয় যে, নদীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হবে। এই কথার মধ্যে দিয়েই দ্বিতীয়দৃশ্যের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয়াঙ্কে তৃতীয়দৃশ্য

স্থান – নাসিকে সাভারকারের গৃহ। সময় – ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ। বিনায়কের বৌদি স্তোত্র পাঠ করতে করতে গৃহকর্ম করছেন। তখন সেখানে প্রবেশ করে বিনায়কের স্ত্রী। তাঁর কটিদেশে কলশ ও

---

[78] ধ. ধ., পৃ. ৩৩

কাঁধে ধৌতবস্ত্রের স্তূপ। তারপর উভয়ের কথোপকথন শুরু হয়। বিনায়কের স্ত্রী বলেন নদীর পথে যে বটবৃক্ষ আছে সেটিকে তিনি প্রত্যহ সহস্রবার প্রদক্ষিন করবেন। কারণ বিনায়কের পঞ্চাশ বছরের জেল হয়েছে। তাঁকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়েছে। বিনায়কের স্ত্রী এই ঘটনায় ভেঙে পড়লে বৌদি তাঁকে আশ্বস্ত করে বীরপত্নী আখ্যা দেন। এরপর তিনি নিজেকে শান্ত করার জন্য বিনায়ক প্রেরিত পত্র পাঠ করতে থাকেন।

দ্বিতীয়াঙ্কে চতুর্থদৃশ্য

ডোঙ্গরী কারাগারের কক্ষ। বন্দীর বেশে বিনায়ক। জেলের ওয়ার্ডার এসে সাভারকারকে রজ্জু কাটার কাজ দিয়ে গেলে তিনি হাতে মুদ্গর নিয়ে নিজের ভাগ্যকে পরিহাস করেন যে, কোথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নাশের জন্য তাঁর জন্ম হয়েছে আর কোথায় তিনি এই জেলে বসে রজ্জু কাটছেন। তুলনাচ্ছলে তিনি বলেন, সমুদ্র মন্থনের জন্য নির্মিত মন্দার পর্বত কি দধিমন্থনের জন্য উপযুক্ত? এরপর বিনায়রের স্ত্রী জেলে আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। উভয়ের কথালাপের মধ্যে দিয়েই এই দৃশ্যের সমাপ্তি।

তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য

স্থান – মুম্বাই -এ সাভারকারের গৃহ। সময় – ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। পার্শ্ববর্তী গৃহে বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তারপর সেখানে প্রবেশ করে ১৮-২০ বছর বয়সের সাভারকারের পুত্র বিশ্বাস। বিশ্বাস দ্বীপশোভা দেখার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে যেতে চাইলে তাঁর মা তাঁকে অনুমতি দেন। এরপর বিনায়ক ও তাঁর স্ত্রীর বার্তালাপ। বিনায়ক তাঁর বাল্যকাল ও কারাগার জীবনের কথা বর্ণনা করেন স্ত্রীর কাছে। এমন সময় সেখানে আসে বিনায়কের বাল্যবন্ধু। বিনায়ক তাঁকে ভারতের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামের কথা, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, চাফেকর,

মদনলাল, ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের কথা বলেন। সাভারকার বলেন ভারত আজ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছে – এটিই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

সময় – ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮। জানা যায় যে নাথুরাম গোডসে গান্ধীজীকে হত্যা করেছেন। বিনায়ক এই হত্যার তীব্র নিন্দা করেন। এরপর দেখা যায় বিনায়ক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংসার জীবনের আলোচনা করছেন এমন সময় অধিকারী এসে বিনায়ককে গান্ধী হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেন।

চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য

এই দৃশ্যে আমুখের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র দৃশ্যটি জুড়ে অভিযুক্ত সাাভারকারের আত্মপক্ষ সমর্থনরূপ সুদীর্ঘ ভাষণ রয়েছে। এরপর সাভারকারের নির্দোষত্ব প্রমাণিত হলে তাঁর মুক্তি হয়।

চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

সাবারকারের স্ত্রী ও তাঁর বন্ধু শান্তারামের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, বিনায়ক ইদানীং বেশী বার্তালাপ করেন না। একাকী থাকতেই পছন্দ করেন। এরপর সেখানে বিনায়কের প্রবেশ হয়। শান্তারাম এক সামাজিক-সমতা-পরিষদে সাভারকারের সভাপতিত্ব কামনা করে কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন না। পরিশেষে দেখা যায় বিনায়ক রায় সাভারকার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি গুঞ্জন করতে করতে সিড়িঁ বেয়ে উপরের কক্ষে চলে যান-

"ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্বমদ্য সংপন্নম্।।"[79]

সাভারকার চরিত

প্রথম জীবন

বিনায়ক দামোদর সাভারকার ওরফে বীর সাভারকারের জন্ম হয় ২৮ মে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ভাগুর গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এখানে সংক্ষেপে সাভারকারের জীবনচরিত বর্ণনা করা হচ্ছে 'ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্' নাটকের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী।

নাটকের শুরুতেই প্রথমাঙ্কে আমরা দেখি ১৫ বছরের বালক বিনায়ক আরণ্যক পাঠ করছেন। তাঁর পিতা তাঁকে বালক বয়সে আরণ্যক পাঠ করতে নিষেধ করলে তিনি বলেন রামচন্দ্র তো বাল্যকালেই বনবাসে গিয়েছিলেন। এর থেকেই প্রতিভাত হয় যে সাভারকার যুক্তি ছাড়া কোন কথা মানতেন না। এরপর দেখা যায় বিনায়কের বন্ধুরা গৃহে আসে তাঁর লেখা নাটকে অভিনয়ের মহড়া দিতে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ রোগ নিবারণের অজুহাতে পুণাতে নিরীহ জনসাধারণের উপর প্লেগ কমিশনার মিঃ রণ্ড যে অত্যাচার করেছিলেন তার প্রতিশোধ নেবার জন্য দামোদর চাপেকর রণ্ড সাহেবকে হত্যা করেন। এই অভিযোগের রায়ে দামোদরের ফাঁসি হয়। এই

[79] ধ. ধ., পৃ. ৮৬

বিষয়কে কেন্দ্র করেই বালক বিনায়ক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনায় নিরীহ মানুষের উপর রণ্ড সৈনিকদের অত্যাচারের করুণ বর্ণনা পাওয়া যায় –

“অন্যোন্যং মন্ত্রণং কুর্বতে

দৃষ্ট উপায়স্তদা জনৈঃ।।

ব্রুবন্তি রঁণ্ডো হ্যনর্থমূলং

হন্তব্যোহয়ং সর্বজনৈঃ।।

স্বজনপীড়নং শ্রুত্বা কোপাৎ

তরুণজনা অরুণায়ন্তে।।

দেশার্থে ত্যক্তজীবিতা যে

ধন্যতামিয়ুঃ কুতো ন তে।।

উৎপদ্যন্তে ম্রিয়ন্তে তু যে

‘দেশজনক’ তাং প্রযান্তি তে।।”[80]

এর থেকেই বোঝা যায় যে বালক অবস্থাতেই তিনি কতটা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরও উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি তাঁর গৃহে ‘মিত্রমেলা’ নামক একটি গোপন বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন। তিনি সগর্বে বলেছেন তাঁর গৃহ হল ‘দেশভক্তদের ধর্মশালা’ –

‘ননু দেশভক্তানাং ধর্মশালা ইতি প্রসিদ্ধমেব অস্মদ্গৃহম্।’

[80] ধ. ধ., পৃ. ১১

ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশকে পরশাসন থেকে মুক্ত করাই ছিল মিত্রমেলার উদ্দেশ্য। এরপর বিনায়কের বিবাহ সম্পন্ন হয় চিপলূণাকর ভাউরায়ের কন্যা যমুনার সঙ্গে। বিবাহের পাঁচ বছর পরে বিনায়ক লণ্ডনে যায় ব্যারিস্টারী পড়তে।

লণ্ডন জীবন

লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে সাভারকারের সাক্ষাৎ হয় বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়ার সঙ্গে। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১ লা জুলাই মদনলাল ধিংড়া লণ্ডনের এক পার্কে সাভারকারের পরিকল্পনা মতো স্যার কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ধিংড়ার সহকারী হওয়ার অপরাধে সাভারকার ২৫ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে নির্বাসিত হন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি কারামুক্ত হয়েছিলেন।

গান্ধী হত্যার অভিযোগ

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারী নতুন দিল্লীর বিড়লা হাউস প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন নাথুরাম গোডসে। নাটকে দেখানো হয়েছে গান্ধী হত্যার অভিযোগে সাভারকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারপর্বে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন স্বরূপ সুদীর্ঘ ভাষণে তাঁর প্রতি করা অভিযোগকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। তিনি বলেন গোডসে ও আপতে শুধুমাত্র তাঁর গৃহে 'হিন্দুধর্ম' বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করতেই আসতেন। এছাড়া অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁর অপর কোন সম্পর্ক নেই। এরপর দেখা যায় তাঁর প্রতি করা অভেযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে তাঁর মুক্তি ঘটে।

সাভারকারের হিন্দুত্ব তত্ত্ব

বিনায়ক হিন্দুত্ব তত্ত্বের প্রচার করেছিলেন কিন্তু তাঁর এই তত্ত্বকে সকলে স্বচ্ছভাবে গ্রহণ করেননি। কারাগারে থাকাকালীন তিনি হিন্দুত্ব তত্ত্বের উপর গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর মতে হিন্দুত্ব কোন ধর্ম নয়, তা হল জীবনের মার্গ। তিনি বলেছেন জাতীয় পরিচিতিতে শিখ, বৌদ্ধ, জৈন সকলেই হিন্দু। বিনায়ক খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের বিরোধী ছিলেন না। তাঁর মতে 'হিন্দু' শব্দটি যদিও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে নির্দেশ করে তথাপি ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষই হিন্দু। তিনি সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষের ভাবনাকে নির্বিচারে সমর্থন করেছেন এমনকি সমস্ত রকম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

সাহিত্যিক সাভারকার

বিনায়ক দামোদর সাভারকার দেশপ্রেমিকের পাশাপাশি ছিলেন একজন সুদক্ষ সাহিত্যিক। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মধ্যে দিয়ে তিনি জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেছেন। গদ্য ও প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তিনি একাধিক কাব্যও রচনা করেছেন। মারাঠী ভাষার জনপ্রিয় গীতিকাব্য 'পোওড়া' রচনা করতেন বাল্যকাল থেকেই। এখানে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল –

১. *১৮৫৭ ছে স্বতন্ত্র্য সমর*

অধিকাংশ ভারতীয় এবং ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা ১৮৫৭ – এর বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যা দেন। কিন্তু সাভারকার এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ধাপ বলেছেন।

তিনি এই গ্রন্থে একজন ভারতীয়ের দৃষ্টিতে ৫৭-এর বিদ্রোহে মীরাট দেশের অবদান বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি মারাঠী ভাষায় রচিত। পরে তা আরও অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

২. *হিন্দুপাদপাৎশাহী*

এই গ্রন্ধটি তিনি রচনা করেন রত্নগিরিতে কারাবাসে থাকাকালীন। গ্রন্থটিতে হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দী, ইংরেজী ও তেলেগু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

৩. *হিন্দুত্ব*

গ্রন্থটিতে হিন্দুত্বের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ব যে এক বিষয় নয় তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সাভারকার। এটিও রত্নগিরিতে কারাগারে থাকাকালীন রচনা করেন তিনি।

৪. *মপ্যালাঞ্চে বন্দা*

সুবিদিত মারাঠী উপন্যাস 'মপলা'-র অনুকরণে গ্রন্ধটি রচনা করেন বিনায়ক। কেরালায় হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উপর ব্রিটিশ শাসকদের ও মুসলমানদের নৃশংস অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে।

৫. *মাজি জন্মাথেপ*

আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দীদশার বর্ণনা আছে গ্রন্থটিতে। মুম্বাই এর ডোঙ্গরী জেল থেকে শুরু করে একে একে থানে ও আন্দামান জেল যাত্রার বর্ণনা করেছেন তিনি। গ্রন্থটি প্রথম ১৯২৭ সালে মারাঠী ভাষায় রচিত হয় এবং তা তৎক্ষণাৎ নিষিদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তীকালে নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে পুনরায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। আরও অনেক ভাষায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

৬. ***কালা পাণি***

রত্নগিরিতে বন্দীদশায় গ্রন্থটি রচনা করেন। আন্দামানের সেলুলার জেলে কিভাবে বন্দীদের উপর বিশেষতঃ বিপ্লবীদের উপর নৃশংস অত্যাচার চলত তার বর্ণনা আছে।

এছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন - 'হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন', 'হিন্দুত্ব ছে পঞ্চপ্রাণ', 'জোসেফ মাজিনি', 'সাহা সোনেরী পানে', 'গান্ধী গোণ্ঢাল' প্রভৃতি। এখানে একটি তালিকাকারে সাভারকারের জীবন চরিতকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল –

২৮ মে ১৮৮৩ মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ভাগুর গ্রামে জন্ম

১ লা জানুয়ারী ১৯৯০ মিত্রমেলা নামক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির প্রতিষ্ঠা

১ লা মার্চ ১৯০১ যমুনা ওরফে মাঈ এর সঙ্গে বিবাহ

২৪ জানুয়ারী ১৯০২ পুণের ফার্গুসন কলেজে ভর্তি হন

মে ১৯০৪ 'অভিনব ভারত' এর প্রতিষ্ঠা

নভেম্বর ১৯০৫ পুণেতে বৈদেশিক পণ্যের উপর অগ্নিকাণ্ড

জুন ১৯০৬ লণ্ডনযাত্রা

১০ মে ১৯০৭ লণ্ডনে ১৮৫৭ – এর মহাবিদ্রোহের সুবর্ণজয়ন্তী পালন।

১৯০৮ Indian war of 1857 গ্রন্থের রচনা

১৩ মার্চ ১৯১০প্যারিস থেকে লণ্ডনে আসার পথে গ্রেপ্তার হন।

৮ জুলাই ১৯১০ ভারতে নিয়ে যাওয়ার পথে জাহাজ থেকে পালিয়ে যান।

৪ ঠা ১৯১১ আন্দামানের সেলুলার জেল যাত্রা

১৯২১-১৯২৩ আলিপুর এবং রত্নগিরিতে বন্দী দশা

৬ ই জুন ১৯২৪ জেল থেকে মুক্তি

৭ জানুয়ারী ১৯২৫ পুত্র প্রভাতের জন্ম

১০ জানুয়ারী ১৯২৫ শ্রদ্ধানন্দ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার উদ্বোধন

১ লা মার্চ ১৯২৭ গান্ধীজী তাঁকে রত্নগিরিতে আমন্ত্রন জানান।

১৭ মার্চ ১৯২৮ পুত্র বিশ্বাসের জন্ম

ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ পতিতপাবন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ নেপালের রাজা হেম বাহাদুর সামশের সিংহ তাঁকে আমন্ত্রণ জানান

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৭ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ১৯তম অধিবেশনের সভাপতি হন

১৫ এপ্রিল ১৯৩৮ মারাঠী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১ লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ হায়দ্রাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১ ভাগলপুর অভিযান

মে ১৯৪৩ তাঁর ৬১তম জন্মদিনে প্রকাশ্যে সংবর্ধনা

১৫ আগস্ট ১৯৪৩ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ

৫ নভেম্বর ১৯৪৩ মারাঠী নাট্য সম্মেলন এর সভাপতি

১৯ এপ্রিল ১৯৪৫ সর্বভারতীয় হিন্দু সভার সভাপতি

এপ্রিল ১৯৪৬ মুম্বাই সরকার কর্তৃক তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা

৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ গান্ধী হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার

১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ অভিযোগ থেকে মুক্তি

২৩ জুলাই ১৯৫৫ লোকমান্য তিলকের শতবর্ষ উদযাপনে প্রধান বক্তা

৮ অক্টোবর ১৯৫৯ পুণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ

১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ আমৃত্যু অনশন গ্রহণ

২৬ ফেব্রুয়ারী ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ

নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা

***ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্*– নাটকের নাটকত্ব সিদ্ধি**

একটি নাটকের নাটকত্ব সাধনের জন্য নাট্যতাত্ত্বিক গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করতে হয়। আলোচ্য নাটকটির ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ বিরচিত ‘সাহিত্যদর্পণ’-এর উপরেই অধিকাংশে নির্ভর করেছি। এছাড়া প্রয়োজনে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যও নিয়েছি। এখানে সাহিত্যদর্পণোক্ত লক্ষণ অনুসারে বিচার করা হচ্ছে –

খ্যাতবৃত্ত

বিশ্বনাথ বললেন ‘নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ’ অর্থাৎ নাটকের ইতিবৃত্ত বা বিষয়বস্তুকে প্রসিদ্ধ হতে হবে। এই প্রসিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অন্তর্ভুক্তি হয়। এছাড়াও খ্যাত বলতে লোকসমাজে প্রসিদ্ধ কোন ঘটনা বা চরিত্রকে আশ্রয় করেও নাটক রচিত হতে

পারে। আলোচ্য নাটকটি দেশপ্রেমিক বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জীবন, দর্শন ও দেশপ্রেমকে আশ্রয় করে রচিত হওয়ায় নাটকের লক্ষণ সংগতি ঘটেছে।

পঞ্চসন্ধিসমন্বিত

নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি-এই পাঁচটি সন্ধির উপস্থিতি। অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে অবস্থার সংযোগেই সন্ধির সৃষ্টি হয়। এখন জানতে হবে অর্থপ্রকৃতি ও অবস্থা কী? অর্থপ্রকৃতি হল নাটকের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির হেতু বা কারণ। বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য – এই পাঁচটি হল নাটকীয় পরিভাষায় অর্থপ্রকৃতি। এই পঞ্চপ্রকার অর্থপ্রকৃতি অর্থাৎ কার্য্যের আবার পাঁচটি অবস্থা হয়। যথা – আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম। নাটকের মুখ্য ফল লাভের জন্য নায়ক বা নায়িকাকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই ধাপগুলিই হল এক একটি অবস্থা। পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি যখন পঞ্চ কার্য্যাবস্থার সঙ্গে মিলিত হয় তখন যথাক্রমে মুখাদি পঞ্চসন্ধির উদ্ভব হয়। নাটকের যে অংশে বীজ উপ্ত হয় এবং তা আরম্ভ নামক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তা হয় মুখসন্ধির স্থল। আলোচ্য নাটকের প্রস্তাবনার -

'বাল্যাৎ প্রভৃতি অদ্য যাবৎ, একমেব বস্তু ময়া স্বপ্নে দৃষ্টম্, জাগরিতে চ নিদিধ্যসিতম্, তন্নাম নষ্টং রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্যং, তস্য চ পুনর্লম্ভনোপায়ঃ'[81]-এই অংশটি নাটকের বীজ এবং এটিই আরম্ভ নামক অবস্থা, তাই এই অংশটিকে আমরা মুখসন্ধির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতেই পারি। উদ্ধৃত অংশটিই নাটকের বীজ। কারণ আলংকারিকদের ভাষায় যে ঘটনা নাটকের শুরুতে অল্পমাত্রায় উক্ত হয়ে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে মুখ্য ফললাভের সহায়ক হয়, তাকেই

[81] ধ. ধ., পৃ. ৪

বীজ বলা হয়। আলোচ্য নাটকের নায়ক বিনায়ক দামোদর সাভারকার বাল্যকাল থেকেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্নপূরণের জন্য অনেক সংগ্রামও করেছেন। নাটকের শেষে দেখা যায় ভারত স্বাধীন হয়েছে। অর্থাৎ নায়কের মুখ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে।

সুখদুঃখসমুদ্ভূত

‘বাল্যাৎ প্রভৃতি অদ্য যাবৎ, একমেব বস্তু ময়া স্বপ্নে দৃষ্টম্, জাগরিতে চ নিদিধ্যসিতম্, তন্নাম নষ্টং রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্যং, তস্য চ পুনর্লম্ভনোপায়ঃ’[82]-এই অংশটি নাটকের বীজ এবং এটিই আরম্ভ নামক অবস্থা, তাই এই অংশটিকে আমরা মুখসন্ধির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতেই পারি। উদ্ধৃত অংশটিই নাটকের বীজ। কারণ আলংকারিকদের ভাষায় যে ঘটনা নাটকের শুরুতে অল্পমাত্রায় উক্ত হয়ে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে মুখ্য ফললাভের সহায়ক হয়, তাকেই বীজ বলা হয়। আলোচ্য নাটকের নায়ক বিনায়ক দামোদর সাভারকার বাল্যকাল থেকেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্নপূরণের জন্য অনেক সংগ্রামও করেছেন। নাটকের শেষে দেখা যায় ভারত স্বাধীন হয়েছে। অর্থাৎ নায়কের মুখ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে।

নাটকের বিস্তৃত পরিসরে মূল বৃত্তান্ত ছাড়াও আরও অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বর্ণনা থাকে। সাহিত্যে সর্বদা মানব জীবনের প্রতিফলন ঘটে। মানুষ যেমন কখনও সুখ আবার কখনও দুঃখ অনুভব করে, ঠিক তেমনই নাটকের মুখ্য চরিত্রেরও কখনো সুখের বর্ণনা থাকে, আবার কখনো দুঃখের বর্ণনা করা হয়। যেমন – আলোচ্য নাটকে নায়ক বিনায়কের বাল্যকাল, পরিবারের সঙ্গে কাটানো সুখের মুহূর্ত, বিবাহ, পত্নীর সঙ্গে কাটানো রমণীয় সময়ের বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর দীর্ঘ কারাগার

[82] ধ. ধ., পৃ. ৪

জীবনের একাকীত্ব, গান্ধী হত্যার অভিযোগ প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনায় দুঃখের বাতাবরণও সৃষ্টি হয়েছে।

নানারসনিরন্তর

যেহেতু নাটকে সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা থাকে, তাই তা নানাপ্রকার রসযুক্ত হবে একথা বলাই বাহুল্য। যেখানে নায়কের দুঃখের বর্ণনা থাকে সেখানে স্বাবাভিকভাবেই করুণ রস ঘনীভূত হয়। আবার যখন নায়ক-নায়িকার মিলন বর্ণিত হয়, সেখানে শৃঙ্গার রস উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বর্তমান নাটকেও বিনায়কের কারাগার জীবনের বর্ণনায় তাঁর স্ত্রীর বিলাপ সহৃদয় চিত্তকে করুণরসে সিক্ত করে। এছাড়াও বাল্যে ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বিনায়কের রসিকতায় বাৎসল্য রসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও দেশের মুক্তি সাধনে ব্রতী সাভারকারের বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক বক্তব্য ও কার্যকলাপে বীররস ঘনীভূত হয়েছে।

অঙ্কসংখ্যা

নাটকের অঙ্কসংখ্যা বিষয়ে আলংকারিকেরা নির্দিষ্ট কোন মত পোষণ করেননি। অঙ্ক অর্থাৎ নাটকের পরিচ্ছেদ পাঁচ থেকে দশের মধ্যে যে কোন সংখ্যা যুক্ত হতে পারে। এ বিষয়ে বিশ্বনাথ বলেছেন –

‘পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্তিতাঃ’।[83]

অর্থাৎ নাটকে পাঁচের কম অঙ্ক থাকতে পারবে না, আবার দশের বেশী অঙ্কও থাকতে পারবে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য নাটকে চারটি অঙ্কের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে চারটি অঙ্কবিশিষ্ট কাব্যকে কি আমরা নাটক বলতে পারি? ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্র’-এ

[83] সা. দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩

নাটকের অঙ্কসংখ্যা বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। বর্তমান যুগে মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাঙ্ক নাটক রচনার পক্ষপাতী। এছাড়াও তাঁরা অঙ্কগুলিকে বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত করেছেন মঞ্চায়নের সুবিধার্থে। বর্তমানে এক, তিন ও চার অঙ্কের নাটক বহুল পরিমাণে রচিত হচ্ছে। যেমন – রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী, অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র প্রমুখ নাট্যকারেরা প্রাচীন আলংকারিকগণ নির্ধারিত নাটকের অঙ্কসংখ্যা সর্বদা অনুসরণ করেননি। এই বিষয়ে তাঁরা স্বকীয় অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। সর্বোপরি নাট্যকার পলসুলে 'ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্'-কে নাটক বলে সম্বোধন করেছেন এবং এই রচনায় নাটকের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলিও বিদ্যমান। তাই এর থেকে বড় আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনা

নায়ক

এবারে আসি নাটকের নায়কের আলোচনায়। প্রথমেই আমরা দেখে নেব আলংকারিক বিশ্বনাথ নায়কের সংজ্ঞায় বলেছেন –

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।

দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ।।[84]

অর্থাৎ নাটকের নায়ক হবেন কোন প্রখ্যাত বংশে জাত রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত গুণান্বিত, প্রতাপশালী, দিব্য, অদিব্য আথবা দিব্যাদিব্য গুণবান্ ব্যক্তি। কিন্তু আলোচ্য নাটকের নায়ক বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রখ্যাত বংশজ নয়, আবার কোন রাজর্ষি ও নয়। তিনি একজন সাধারণ মানব মাত্র। কিন্তু লক্ষণোক্ত গুণবান্ শব্দটি তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আলংকারিক অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্রের মতে, সাধারণ গুণবান্ মানবও নাটকের নায়ক হতে পারে। সাভারকার একজন

[84] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৬৮

দেশপ্রেমিক। আর দেশভক্ত বিপ্লবীরা আধুনিক যুগের সংস্কৃত নাটকের নায়ক হিসেবে স্থান পেয়েছে। যেমন- নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন প্রমুখ। অতএব দেশপ্রেমিক সাভারকার নিঃসন্দেহে নাটকের নায়ক হওয়ার উপযুক্ত পাত্র।

রসতত্ত্ব

ভরত থেকে শুরু করে অর্বাচীন কালের সকল সাহিত্য সমালোচকেরা নাটকে রসের অপরিহার্যতা স্বীকার করেছেন। নাটক রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল আনন্দবিধান। আর নাটক পড়ে বা দেখে আমাদের যে অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতিই হল রস। ভরতাচার্য আট প্রকার রস স্বীকার করলেও তাঁর পরবর্তী আলংকারিকেরা নবরসের বিধান দিয়েছেন। এই নয়টি রসের মধ্যে যে কোন একটি রস নাটকে প্রাধান্য পায়, সেই রসটি হল অঙ্গীরস। আলংকারিক বিশ্বনাথের মতে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত রসের মধ্যে যে কোন একটি হবে নাটকের অঙ্গীরস। এছাড়াও আরও অনেক অপ্রধান রসের উপস্থিতি থাকে নাটকে, যেগুলি অঙ্গীরসের পরিপুষ্টিতে সহায়তা করে। এই রসগুলিকে বলে অঙ্গরস। একটি নাটকে একাধিক অঙ্গরস থাকতে পারে। এ বিষয়ে 'সাহিত্যদর্পণ'-এ উল্লিখিত হয়েছে-

"এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।

অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্।।"[85]

বর্তমান নাটকের অঙ্গীরস হল বীর। সমগ্র নাটক জুড়ে নায়ক সাভারকারের বীরত্ব দেখানো হয়েছে। সাভারকারের শত্রুপক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার হল আলম্বন বিভাব। তাঁদের দেশকে বঞ্চনা করা রূপ চেষ্টা হল উদ্দীপন বিভাব এবং সাভারকারের প্রতাপ, বিনয়াদি রূপ অনুভাবের

[85] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৬৮

দ্বারা অনুভাবিত হয়ে সহৃদয়ের চিত্তস্থিত উৎসাহ বীররসে পর্যবসিত হয়েছে। নাটকের প্রথমাঙ্কে বিনায়কের উক্তিতে বীররস অনুভূত হয় –

"দিষ্ট্যা মুক্তোঽস্মি অধুনা বাবার্য চিন্তাভারাৎ। সংবৃত্তশ্চাস্মি সম্প্রতি সমর্থঃ বীরচিন্ততয়া উভয়মপি অগ্রতঃ সরীকর্তুম্, একতঃ অধ্যয়নম্, অপরতশ্চ রাষ্ট্রোদ্ধারস্য ব্যপারম্।....কিঞ্চিদূনানি ত্রীণি বর্ষানি জাতানি। প্রতিজ্ঞাহোরণস্য ত্রীণি বর্ষাণি ভবিষ্যন্তি। তদানীম্ অহম্ এক এব আসম্, অসহায় আসম্। অধুনা পঞ্চাশৎ জনাঃ সন্তি মৎসমানচিন্তাঃ, মৎসমানস্বপ্নদর্শিনঃ, অহমিব রাষ্ট্রস্বাতন্ত্রস্য বাসনয়া বাসিতান্তঃকরণাঃ। কামং পঞ্চাশৎ নাম নগণ্যা সংখ্যা। কামং নাস্তি এতেষাং হস্তে ক্ষুরিকাতঃ কিমপি তীক্ষ্ণতরং শস্ত্রম্। কিং তু অস্যাঃ পঞ্চাশৎ এব শ্বঃ পঞ্চাশল্লক্ষাঃ ভবিতারঃ। এতেষাং ক্ষুরিকাশ্চ শতঘ্নীষু পরিণতা ভবিতারঃ। শ্বস্তনানাং দেশভক্তানাং মিত্রমেলাপকঃ আদিপীঠং ভবিষ্যতি, অস্মিংশ্চ মিত্রমেলাপকে অভিনবভারতস্য দর্শনং ভবিষ্যতি।"[86]

এছাড়াও অঙ্গরস হিসেবে করুণ, শান্ত, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

রচনাশৈলী

ভট্টতৌত বলেছেন, বাগ্দেবীর দুইটি মাত্র পথ – একটি শাস্ত্র, অপরটি কাব্য। শাস্ত্রের উদ্ভব হয় প্রজ্ঞা থেকে আর প্রতিভা থেকেই কাব্যের জন্ম হয়। এই প্রজ্ঞা ও প্রতিভার যুগ্ম সমাবেশ আমরা লক্ষ্য করি কবি জি. বি. পলসুলের মধ্যে। কারণ কাব্য রচনার পাশাপাশি ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বেও তাঁর অনায়াস বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান নাটকটির আলোচনায় পলসুলে প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে স্বকীয় শৈলীর উদ্ভাবন করেছেন। প্রথমেই কথা বলতে হয় ভাষার ব্যবহার নিয়ে।

[86] ধ. ধ., পৃ. ২৬

সমাসবিহীন, কমনীয় পদের প্রয়োগ নাটকটির অন্যতম আকর্ষণ। নাটকের প্রতিটি চরিত্রই সংস্কৃতভাষী। নাটকটির রচনা স্থান মহারাষ্ট্র। তাই সংস্কৃতের পাশাপাশি মারাঠী শব্দের প্রয়োগ করেছেন কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। চরিত্রেরা একে অপরকে মারাঠী ভাষায় সম্বোধন করেছেন। যেমন -

অণ্ণা	বাবা
বাবা	বড় ভাই বা দাদা
বহিনী	বৌদি
ভাউজী	দেবর বা ছোট ভাই
তাত্যা	সম্মানসূচক সম্বোধন

মারাঠীর পাশাপাশি ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও নাটকটিতে করেছেন কবি। প্রথমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে লণ্ডনে সাভারকার ও নিরঞ্জনের কথালাপে ইংরেজী বাক্যের ব্যবহার দেখা যায় –

নো নো। শী ওয়ান্টেড মী টু এনজঁয় দি সী ব্রীজ়...ফাঁর গুড্।'[87]

নান্দীর অভাব নাটকটির রচনাশৈলীর অপর একটি বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোককে নান্দী বলা হয়, যে অংশে নাটকের অভীষ্ট ফল লাভের কামনা করা হয়। কিন্তু আলোচ্য নাটকের সূত্রপাত হয় আমুখ বা প্রস্তাবনার মধ্যে দিয়ে। যেখানে পাশ্চাত্য Flash Back পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন কবি। যেটি নিঃসন্দেহে আধুনিকতার সাক্ষ্য বহন করছে।

[87] ধ. ধ., পৃ. ৩৪

নাট্যের প্রায়োগিক দিক সম্পর্কেও পলসুলের স্বচ্ছ ধারনা ছিল। প্রতিটি অঙ্ককে একাধিক দৃশ্যে বিভক্ত করেছেন তিনি। এছাড়াও নাটকটিতে গানের প্রয়োগও অত্যন্ত রমণীয়।

ছন্দোবিচার

বৈদিক সংহিতার প্রায় সমস্ত মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। সেখানে ছন্দের বিপুল বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বৈদিক সংহিতায় মূলতঃ ৭ টি ছন্দের ব্যবহার হত – গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। প্রত্যেকটির আবার নানান ভেদ-উপভেদ ছিল। লৌকিক সংস্কৃতে বৈদিক ছন্দের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র অনুষ্টুপ্ ছাড়া আর কোন বৈদিক ছন্দের ব্যবহার লৌকিকে দেখা যায় না। গঙ্গাদাসের ‘ছন্দোমঞ্জরী’তে ২৮০ টি ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। লৌকিক সংস্কৃত কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছন্দ হল- অনুষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল, দ্রুতবিলম্বিত, বসন্ততিলক, শালিনী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালিনী, রুচিরা, শিখরিণী, তোটক, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি। কবিরা বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন – বিরহের বর্ণনায় মন্দাক্রান্তা, পরাক্রমে বংশস্থবিল, হর্ষে প্রহর্ষিণী, পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণনাবসরে অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কবিরা তাঁদের কাব্যে স্বেচ্ছায় ছন্দের প্রয়োগ করে থাকেন। পলসুলে বিরচিত ‘ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহম্’ নাটকে প্রায় সর্বত্রই অনুষ্টুপ্ ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণ নির্ণয় করে বলেছেন –

“পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।

গুরু ষষ্ঠঞ্চ পাদানাং শেষেষ্বনিয়মো মতঃ।।”[৪৪]

[৪৪] *ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ১৮১

এখানে উদাহরণ হিসেবে আলোচ্য নাটকের দ্বিতীয়াঙ্ক থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হল –

“নমোঽস্তু শিরসা তুভ্যং বৎসলে বহিনী মম।

যয়াস্মি বর্ধিতম্ তাদৃগ্ যথা মাতাঽপি ন স্মৃতা।।”[89]

এছাড়াও নাটকের ভরতবাক্যটিও অনুষ্টুপ্ ছন্দে বিধৃত –

“ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্বমদ্য সংপন্নম্।।”[90]

অনুষ্টুপের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল শ্রুতিমাধুর্য, যা সমগ্র নাটক জুড়ে অনুভূত হয়।

অলংকার বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র আলোচ্য নাটকের অলংকার বিষয়ে বলা হচ্ছে। অধিকাংশ স্থলে অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ হয়েছে। যথা –

‘কুসুমানি সহস্রাণি বিকসন্তি দিনে দিনে।’[91]

উদ্ধৃত অংশটিতে ‘স’, ‘দ’ ও ‘ন’ – এর অনুপ্রাস লক্ষণীয়। এছাড়া নাটকটি পাঠে ভাষার সরলতা আমাদের মুগ্ধ করে। অতএব এখানে প্রসাদ গুণ হয়েছে একথা বলতেই পারি। কারণ আলংকারিকদের মতে শব্দের অর্থ যদি সহৃদয়ের কাছে সহজে বোধগম্য হয়, তবে সেই রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়। আলংকারিক বামনাচার্যের মতে –

---

[89] ধ. ধ., পৃ. ৪৫

[90] তত্রৈব., পৃ. ৮৬

[91] তত্রৈব, পৃ. ৪৫

‘শৈথিল্যং প্রসাদঃ।’[92]

অর্থাৎ পদরচনার শিথিলতাই হল প্রসাদগুণ। সমস্ত দিক আলোচনা করে একথা বলতে পারি যে, নাট্যকার পলসুলে এই নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর অনন্য সাধারণ কারয়িত্রী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

[92] কা. সূ. বৃ., পৃ. ১১৫

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

বাংলাদেশোদয়ম্ – একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশোদয়ম্– একটি সমীক্ষা

নাটক- *বাংলাদেশোদয়ম্।* নাট্যকার – রামকৃষ্ণ শর্মা। প্রকাশনা কাল – ১৯৮৮। প্রকাশনা স্থান – নাগ প্রকাশক, দিল্লী।

প্রধান চরিত্র – মুজিবুর রহমান, ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান প্রমুখ। অঙ্কসংখ্যা – ১০।

নাটকটির কথাবস্তু

প্রথমাঙ্ক – প্রথাগত নান্দী ও প্রস্তাবনার মধ্যে দিয়েই নাটকটির সূচনা হয়। এরপর প্রথমাঙ্কে দেখা যায়, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে একটি সভার পর শেখ মুজিবুর রহমান একটি সাংবাদিক সম্মেলন করছেন, সেখানে মুজিবুর মাতৃভূমির প্রতি, বাংলার সংস্কৃতির প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছেন, কারণ তিনি তাদেরই একজন, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, তাদের ভাষায় কথা বলেন, তাদের সমস্যাগুলো জানেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংসার পথকেই অবলম্বন করেন। তিনি ব্যথিত হন পূর্ববঙ্গের মানুষের উপর পাকিস্তানী শাসকদের অত্যাচার দেখে। বাংলা ভাষার পরিবর্তে যে উর্দু ভাষার প্রচলন করতে চাইছেন পাক-শাসকরা, তার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাই আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা মুজিবুরের একটাই উদ্দেশ্য যে, তাঁর দলের সমস্ত সদস্য সে হিন্দু হোক বা মুসলমান নির্বিশেষে তাদের সমস্ত রকম দরিদ্রতা, হীনতা এবং শোষন থেকে মুক্ত করা। তাঁর এই বক্তব্য রাখার পরেই সে সংবাদ পেয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজ্যপাল ভাইস এডমিরাল এহ্সানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান।

তার পর এক গুপ্তচরের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে দুই সাংবাদিককে রজাকারেরা[93] বন্দী করেন। চতুর্থ রাজাকার এবং এক গুপ্তচর অলবদর[94] দলের সদস্য হিসামুদ্দিনের আসার অপেক্ষা করেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান হিসামুদ্দিনকে আদেশ দিয়েছেন যে, নির্বাচনের রায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যায় তবে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতে। এছাড়াও সে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাদের প্রদর্শন শেখায়। এভাবেই প্রথমাঙ্কের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয়াঙ্ক- বিষ্কম্ভক অংশে বন্দনা, আকীলা ও রুকসানা এই তিনজনের কথোপকথন। তাঁদের আলোচনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিস্তর পার্থক্য ফুটে ওঠে। তাঁদের কথোপকথনে আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা মুজিবুর রহমানের উপর তাঁদের অগাধ বিশ্বাস ধরা পড়ে।

দ্বিতীয়াঙ্কের সূচনা হয় ভাইস এডমিরাল এহসান, রাও ফরমান আলী এবং দুইজন অন্য অধিকারীর কথোপকথন দিয়ে। সেখানে তাঁরা খেদ প্রকাশ করেন যে বাঙালীরা তাদেরকে মান্যতা দিচ্ছেন না। এমন সময় দ্বাররক্ষী এসে জানায় যে মুজিবুর রহমান এসে গেছেন। এহসান মুজিবুরকে বলেন পূর্ববঙ্গের মানুষদের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে মিলিত হয়ে থাকার। তা না হলে তাদের প্রথম সারির শত্রু ভারত তাদের অধিগ্রহণ করবে। এর উত্তরে মুজিবুর জানান, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রথম সমস্যা খাদ্য, দ্বিতীয় বস্ত্র আর তৃতীয় হল আশ্রয়।

[93] রজাকার একটি আরবি শব্দ যার অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। অপরদিকে বাংলাদেশে রাজাকার একটি নিন্দাসূচক শব্দ যার অর্থ দেশদ্রোহী।

[94] ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাকে সহায়তা দানকারী নিন্দিত আধা-সামরিক বাহিনী।

বাকি সমস্ত এর পরে। তাই এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে থাকা দরকার। এরপর এহসান ও ফরমান আলী আলোচনা করতে থাকেন যে ইয়াহিয়া খানের সাথে পরামর্শ করে তারা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে। নির্বাচনের পাশাপাশি যুদ্ধের প্রস্তুতিও চলবে।

তৃতীয়াঙ্ক- দ্বিতীয় অংকের বিষ্কম্ভকে যে তিন মহিলার কথোপকথন চলছিল ঠিক সেই ভাবেই তাদের কথোপকথনেই তৃতীয় অংকের শুরু হয় এক নদীতটে। বন্দনা, রুকসানা ও আকীলা এই তিনজনের মধ্যে আকিলার বিবাহ স্থির হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কোন এক ব্যক্তির সাথে। ইতিমধ্যেই সেখানে দুজন পাকিস্তানি আধিকারিক এসে নাবিকের খোঁজ করে এবং তাদের সাথে অশালীন আচরণ করতে থাকলে সেখানে নাবিক এসে উপস্থিত হয়। আধিকারিকদের তীরে পৌঁছে দিয়ে নাবিক পারিশ্রমিক চাইলে তাকে চড় মারা হয়। সেই সময় নদীতীরে মোহন ও বশির নামক দুইজনের আবির্ভাব হয়। তারা এসে নাবিককে জানায় যে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতেছে, তাই তাদের নেতা মুজিবুর আসছেন ভাষণ দিতে। একথা শুনে সবাই খুশি হয়। তারপর মঞ্চে একজন নেতা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে এবং মুজিবুর মঞ্চে এসে জনতার প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির কথা বলেন। আর এটাও বলেন যে কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে। এরপর দুজন গায়ক মঞ্চে এসে দেশাত্মবোধক গান গায়। এভাবেই শেষ হয় তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক- প্রবেশকে লাহোরের এক পানশালায় এক সুরাপানকারী ও সুরাবিক্রেতার কথোপকথন। সেখান থেকে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি জানা যায় -

১. ইয়াহিয়া খান ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।

২. একদিকে যুদ্ধজাহাজে অস্ত্র যাচ্ছে অপরদিকে মুজিবকে শান্তির বার্তা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

৩. লাহোরে ৩০ জানুয়ারী ভারতীয় বিমান অপহরণ করা হয়েছে।

৪. ভাইস এডমিরাল এহসানকে সরিয়ে টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজ্যপাল করা হয়েছে।

৫. রজাকার, অলবদর প্রভৃতি দলের সদস্যরা পূর্বপাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে।

৬. ২৫ শে মার্চ ঢাকায় রাষ্ট্রসভার অধিবেশন হবে সেখানে ইয়াহিয়া মুজিবুরের সাথে আলোচনায় বসবে তার পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে।

প্রথম দৃশ্য- ঢাকার রাজভবনে ইয়াহিয়া খান ও মজিবুরের বার্তালাপ চলছে। রাজ্যপাল টিক্কা খান সভা পর্যবেক্ষণ করছেন। এমন সময় সেখানে মুজিবের সমর্থকরা এসে উপস্থিত হলে প্রহরীদের সাথে তাদের হাতাহাতি শুরু হয় এবং সেই কোলাহল শুনে মুজিবুর ও টিক্কা খান বাইরে আসেন। মুজিব তাঁর সমর্থকদের বলেন তিনদিনের আলোচনার কোন সমাধান এখনো হয়নি। তাই ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আবার বৈঠক শুরু হয়। এমন সময় সেখানে চারজন পথিককে রাস্তায় দেখে প্রহরীরা তাদের সরে যেতে বলেন। পথিকরা তাদের অপরাধ জানতে চাইলে প্রহরীরা অকারণে তাদের প্রহার করেন। তখন এক অফিসার এসে বলেন বাঙ্গালীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে। তারপর ইয়াহিয়া বাইরে এসে সব বাঙ্গালীদের এবং মুজিবুরকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। টিক্কা খান তাকে জানায় যে মুজিব

সেখান থেকে পালিয়েছে। একথা শুনে তিনি প্রহরীকে আদেশ করেন যেভাবেই হোক মুজিবকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য- অলবদর দলের তিনজন সদস্যকে মঞ্চে দেখা যায়। তাদের মধ্যে হিসামুদ্দিন তার বাকি সঙ্গীদের বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপকদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করতে। সে বলে সমস্ত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ্, অর্থনীতিবিদ্, ঐতিহাসিক, কবি এবং দার্শনিকদের একটি তালিকা রাও ফরমান আলীকে পাঠাতে হবে। এছাড়াও সে অলবদর দলের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ‘ইল্লিলা’ বলে একটি শব্দ উচ্চারণের আদেশ দেন এবং সবাই সেই আদেশ মত কাজ করতে প্রস্তুত হন। এরপর হিসামুদ্দিন একটি বাক্স থেকে বিভিন্ন রকম আগ্নেয়াস্ত্র বের করে তার সঙ্গীদের সামনে রাখে এবং তাদের পছন্দ মতো অস্ত্র তুলে নিতে বলে। তারপর সকলেই ‘আল্লা হো আকবর’ এই ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে মঞ্চ ছেড়ে দেয়।

পঞ্চমাঙ্কে প্রথম দৃশ্য- পূর্ব বাংলার অসহায় বাঙালীদের বর্ণনা করা হয়েছে , যাঁরা পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারে গৃহহীন হয়েছেন। নেপথ্যে অস্ত্রের শব্দ, অসহায় বাঙালীদের বিলাপ এবং সর্বত্র বিপর্যস্ত জনজীবনের চিত্র। ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার পীড়িত, লুণ্ঠিত এবং অবদমিত শরণার্থীরা একে অপরকে তাদের দুরবস্থা বর্ণনা করতে থাকে। ইতিমধ্যে পাক সেনারা এসে অত্যাচার শুরু করে। এমন সময় হিসামুদ্দিন এসে পাক সেনাদের উৎসাহ দিয়ে বলে, যে সমস্ত বাঙালীরা ইয়াহিয়া খানের শাসনের বিরুদ্ধে গেছে তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য- এই দৃশ্যে ছায়া চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কিভাবে পাকসেনারা অসহায় বাঙ্গালীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করছে। মহিলাদের শারীরিক ভাবে নির্যাতন করছে আর সর্বত্র বাঙ্গালীদের করুণ বিলাপ ভেসে আসছে। পাক সৈনিকরা বালক এবং বৃদ্ধদের মারতে থাকে। বালকেরা তখন 'মা, মাগো, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও' এইসব বলতে বলতে এদিক ওদিক পালাতে থাকে। সেনারা বাঙালী তরুণীদের উপর নির্যাতন করতে থাকে। তরুণী তখন 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমার শরীর ভালো না. হায়! মরে গেলাম' এই বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এইভাবে পঞ্চমাঙ্ক শেষ হয় এবং পট পরিবর্তন হয়।

ষষ্ঠ অঙ্কে প্রথম দৃশ্য - ভারতীয় নেতা, মন্ত্রী এবং অফিসারেরা পাক শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের মানুষদের অবস্থা এবং ভারতে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। পূর্ববঙ্গে যে সংঘাত তৈরি হয়েছে অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ভারতে তার প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের ভূমিকা নিয়ে একটি বৈঠক হয় এবং সেখানে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের ভারতে পাঠিয়ে ভারতকে পরোক্ষভাবে এই সংঘাতে জড়িয়ে পাকিস্তান যে স্পর্ধা দেখিয়েছে তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে ভারত। বৈঠকে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে শরণার্থীরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই স্থান পরিদর্শন করা হবে। এছাড়া এই বৈঠকে ভারতীয় নীতি, কূটনীতি, সামরিক কৌশল এবং বাংলাদেশের নেপথ্যের ইতিহাসও খুব দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য - এই দৃশ্যে পূর্ব বাংলার পীড়িত শরণার্থীদের করুণ দৃশ্য এবং ভারতীয় স্বয়ং-সেবকদের তাদের প্রতি আতিথ্য বর্ণিত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, বিপক্ষীয় নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতারা শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যান। শরণার্থীরা পূর্ব বাংলার মানুষের উপর হওয়া নৃশংসতার একটি সুস্পষ্ট বিবরণ দেন। প্রধানমন্ত্রী এবং অনান্য মন্ত্রীরা মন্ত্রিপরিষদকে বলেন এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রী তিনটি প্রতিজ্ঞা নেন-

১. পূর্ববঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

২. বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের মুক্তি।

৩. শরণার্থীদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন।

বিষ্কম্ভকের প্রথম ভাগ- আগরায় এক বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী বিশ্রামাগারে ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যার ঘটনা। কিছু যাত্রী বাসের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। একজন যাত্রী সংবাদপত্র পড়ছেন। অপর যাত্রী খবর জানতে চাইলে সেখানে উপস্থিত সকলে মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। তারপর তারা সকলে সন্ধ্যাকালীন প্রভৃতির শোভা উপভোগ করতে থাকেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত দিকে সাইরেনের গগনভেদী শব্দ শোনা যায় এবং গৃহরক্ষকের ধ্বনি শোনা যায়- ‘আলো বন্ধ করো’। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধবিমানের তীব্র গর্জন শোনা যায়। সাধারণ মানুষেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক ওদিক পালাতে আরম্ভ করে।

বিষ্কম্ভকের দ্বিতীয় ভাগ- দুজন গৃহরক্ষক ও তিনজন রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বয়ংসেবক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হওয়া ব্ল্যাক আউট নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। সেই সময় একজন স্বয়ংসেবক ট্রান্সিস্টর চালালে আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ শোনা যায় যে,

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। পাকিস্তানী বায়ুসেনা অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, যোধপুর, এবং আগরায় অবস্থিত ভারতীয় বিমান সংস্থার উপর হঠাৎ বোমা বর্ষণ শুরু করেছে। বিগত মার্চ মাস থেকে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পূর্ব বাংলার নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে কিছু মানুষ সংঘর্ষের পক্ষে গেছে, আর কিছু অসহায় মানুষ জীবনরক্ষার জন্য ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এখন পূর্ব পাকিস্তানের সংঘর্ষ ভারতের সাথে যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। অতএব ভারতের সামনে যুদ্ধ ছাড়া অপর কোন রাস্তা নেই। প্রধানমন্ত্রী এই আশা রাখেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সমস্ত নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় সম্মান রাখার জন্য ভারত সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। আর ভারতের সমস্ত জনতা একত্রিত হয়ে পাকিস্তানের এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে।

সপ্তমাঙ্ক- সমগ্র সপ্তমাঙ্ক জুড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস, বীরত্ব, শৌর্য এবং ঔৎসুক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক সেনা তাদের স্থান সম্পর্কে সচেতন। নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে এবং ভারতের মর্যাদা রক্ষায় আত্মবলিদান দিতেও তারা প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জেনারেল মানেকশার সঙ্গে সেনা শিবিরে যান। সেখানে গিয়ে তিনি পূর্ববঙ্গে ভারতীয় সেনাদের গতিবিধি সম্পর্কে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাকে জানানো হয় যে ভারতীয় সেনাদল বালুরঘাট, সিলহাট, আগরতলা এবং কুমিল্লা - এই সমস্ত জায়গা দিয়ে ক্রমাগত ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পাক সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য। বাংলাদেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করাই হল ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রবেশক - একটি নগরের দৃশ্য। চারিদিকে গর্ত, ফাটল দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে আলবদর এর সদস্য হিসামুদ্দিন তার এক সহায়কের সাথে মঞ্চে প্রবেশ করে। তারা আলোচনা করতে থাকে যে পাকিস্তানী সেনারা ভারতীয় সেনাদের ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে রয়েছে। ভারতের যুদ্ধবিমানের শব্দে হিসামুদ্দিন ও তার সহায়ক পুনরায় গর্তে প্রবেশ করে। সেই সময় শামশুদ্দীন ও এক রজাকার প্রবেশ করে। তাদের কথোপকথন থেকেই জানা যায় যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নবম ডিভিশনের সঞ্চালক মেজর জেনারেল আনসারী এবং অন্যান্য অফিসারেরা ভারতের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। ভারতীয় যুদ্ধবিমান পাকিস্তানী রাজভবন এর উপর বোমা বর্ষণ শুরু করেছে। সবাই বলতে থাকে যে বাঁচার জন্য গর্তে প্রবেশ করাই শ্রেয়। তখন একজন রজাকার যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে যায়।

অষ্টমাঙ্কে প্রথম দৃশ্য - পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ভীতি, হতাশা, নীতিভ্রষ্ট হওয়া এবং চূড়ান্ত পতন দিয়ে এই দৃশ্যের সূত্রপাত। সন্ত্রাসে জর্জরিত হয়ে এবং ভারতীয় সেনাদের প্রতিনিয়ত বোমা বর্ষণে পাক সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গায় পরিখা খনন করে আশ্রয় নেয়। মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় ভারতীয় সেনারা তাদের সমস্ত দিক থেকে অবরুদ্ধ করে। তাদের আর পালানোর কোনো পথ থাকে না। তাদের পক্ষে নিজেদের জীবন বাঁচানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। যখনই তারা সুযোগ পাচ্ছে তখনই পরিখা থেকে বেরিয়ে এসে একে অপরের সাথে তাদের কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। কেউ কেউ ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভুল নীতির সমালোচনা করছেন, আবার কেউ কেউ পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান চালানোর জন্য তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দোষারোপ করছেন। পাকসেনাদের এই চরম মানসিক বিপর্যয়ের সময় ভারতের সামরিক বাহিনীর লেফটন্যান্ট জেনারেল শ্রী জ্যাকব সেখানে এসে বলেন যদি পাকিস্তান তাদের সমস্ত অস্ত্র

ফেলে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে তারা প্রাণে বাঁচতে পারবে। পাকিস্তানী সেনারা বুঝতে পারে যে, স্থল, জল এবং আকাশ কোন পথেই তাদের ঢাকা থেকে পালানোর আর কোন পথ নেই। তারা জ্যাকবের কাছে আত্নসমর্পন করতে বাধ্য। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনারা ৯৩০০০ সৈন্যসহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে ইস্টার্ন কম্যান্ড লেফটন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য - এই দৃশ্যে পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ দেখানো হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে সংবাদমাধ্যম ও তথ্য সংগ্রহকারী সংস্থা আসে এই দুর্লভ দৃশ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে। মঞ্চে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং অন্যান্য অফিসারের পাকিস্তানী বাহিনীকে নিয়ে আসে। শ্রী অরোরা যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় যুদ্ধ জয় করেছে এবং ৯৩০০০ পাকিস্তানী সেনা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্ব বাংলার মানুষেরা তাদের আবেগ আটকাতে পারেনি। তারা চেয়েছে পাকিস্তানি সেনাদের জীবন্ত জ্বালানো হোক। তখন ভারতীয় সামরিক বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টি সামলায় এবং ধৃত পাকসেনাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এর মধ্য দিয়েই অষ্টমাঙ্ক শেষ হয়।

নবমাঙ্ক- ফিল্ড মার্শল ইয়াহিয়া খান তার বাসস্থানে সমস্ত পরিচারিকাদের সঙ্গে রয়েছেন। তাকে বিচলিত দেখে তার এক পরিচারিকা সমস্ত রকম ভাবে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। মদমত্ত ইয়াহিয়া খান কল্পনা করতে থাকে যে পাকিস্তান যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কিছুক্ষণ পরেই তার এই দিবাস্বপ্ন ভাঙে। এক অঙ্গরক্ষক এসে তাকে জানায় যে, পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষ ন্যাজি সেনাদের নিয়ে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি

জানিয়ে বলেন যে ভারতের দূত এসেছেন। ভারত দূত শান্তির বার্তা নিয়ে এসে বলেন যে, ভারত একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। যদি পাকিস্তান তার সেনাদের এবং নিজেদের মঙ্গল চায় তবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করুক। ইয়াহিয়া খান ভারতের প্রস্তাব মেনে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। এখানেই নবম অঙ্ক শেষ হয়।

দশম অঙ্ক - বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পুষ্পশোভিত একটি মঞ্চের দৃশ্য। যেখানে একদিক থেকে বাংলাদেশের জয় হোক, শেখ মুজিবুর রহমানের জয় হোক ইত্যাদি ঘোষণা করতে করতে জনসমুদায় প্রবেশ করে। অপরদিকে দেখা যায় তিনজন ব্যক্তি সভামঞ্চের ব্যবস্থা করছে। এক আয়োজক মঞ্চে এসে দর্শকদের শান্তিতে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন। আর বলেন স্বাধীন বাংলাদেশে আজকের এই সভার আয়োজন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আনন্দে এবং বাংলাদেশের উদয়ে মুখ্য সাহায্যকারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মানিত করার জন্য। তাই যতক্ষণ না নেতৃবৃন্দ এসে উপস্থিত হচ্ছেন ততক্ষণ ক্রান্তিকারী কবি শ্রী করিম খান কবিতা পাঠ করবেন। তারপর করিম খান মঞ্চে এসে যুদ্ধে নিহত সাধারণ মানুষদের প্রতি এবং সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং পাকিস্তানের ও ইয়াহিয়া খানের দুর্দশার বর্ণনা করেন। এরপর মঞ্চে ডী. পী. ধর, ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবুর রহমান প্রবেশ করেন। মুজিবুর ফুলের মালা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কে স্বাগত জানায়। মুজিবুর রহমান মাতৃভূমিকে নমস্কার করে বলতে থাকেন যে, এটা তাঁদের পরম সৌভাগ্য যে স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এসেছেন। এখন উপনিবেশবাদ ও ধর্মের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। লোকশক্তির বিজয় হয়েছে, অধর্মের শেষে ধর্মের জয় হয়েছে। তারপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মঞ্চে এসে বলেন, আজ মুক্তির দিন। এখন বাংলাদেশের শাসন ভার বাংলাদেশের

মানুষের উপরে। ভারতবর্ষ এটাই প্রার্থনা করে যে সবাই সুস্থ থাকুক, নীরোগ থাকুক এবং সুদিন দেখুক। তিনি আরও বলেন যে, কখনো কখনো শান্তির জন্যও যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতের সেনারা আত্মবলিদান দিয়ে যে জয় নিশ্চিত করেছে তাদের প্রতি তিনি সমবেদনা জানান। তিনি যে তিনটি প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তা পূরণ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ ১. পাকিস্তানের কবল থেকে মুজিবুরকে মুক্ত করা। ২. ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের নিজের দেশে প্রেরণ করা এবং ৩. বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্থাপনা করা। ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মান্যতা দিয়েছে সর্বপ্রথম। তারপর একে একে ভুটান, পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন সবাই মান্যতা দিয়েছে। তিনি এও ঘোষণা করেন যে, নবোদিত বাংলাদেশে সমস্ত সরকারি ব্যবস্থা স্থির হওয়ার পর সৈনিকরা দেশে ফিরে যাবে। দশম অঙ্কের অর্থাৎ নাটকের সমাপ্তি হয় মুজিবুরের ভরতবাক্য উক্তির মাধ্যমে- যতদিন এই পৃথিবীতে গঙ্গা, যমুনা থাকবে, যতদিন হিমালয় পর্বত থাকবে ততদিন ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রী অক্ষুন্ন থাকবে। আজ বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে এবং সবসময় একসাথে গীতা ও কোরান পাঠ করবে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

যেকোনো মূল ঘটনার নেপথ্যে আরও অনেক কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করার আগে যুদ্ধের প্রাক্কালীন কিছু কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সকলেরই কম বেশি জানা। যদিও *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকটির কাহিনীটি ১৯৭০ এর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময় এর বর্ণনা দিয়ে শুরু হচ্ছে তবুও তার পূর্ববর্তী কিছু ঘটনা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি। দেশভাগের সময় থেকেই পূর্ব

ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জনসংখ্যা, অর্থনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তর বৈষম্য ছিল। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে প্রভূত শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তান সব সময় পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে এসেছে। আর অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড় হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের উপর নিপীড়ন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র হবে উর্দু। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। যে প্রতিবাদের ফলশ্রুতি ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন। যে আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের অনেক নিরীহ মানুষ। আর তখন থেকেই ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখটি সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলে খ্যাত। যার ফলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হলে দেখা যায় পূর্ববাংলার বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ ১৬২ এর মধ্যে ১৫১ টি আসন লাভ করেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্স পার্টি ১৩৮ এর মধ্যে ৮২ টি আসন পেয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগণ বুঝতে পারে যে এবার পূর্ব পাকিস্তান দেশ শাসন করবে। কিন্তু তারা তা হতে দেবে না। পাকিস্তান ষড়যন্ত্র করতে থাকে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা চালানোর। তারা মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ও ২৫শে মার্চ ঢাকায় নির্মম গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে যান। পশ্চিম পাকিস্তানের নির্মম অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে প্রায় ১ কোটি শরণার্থী ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নেয়। ফলে ভারত প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হয়।

ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী ও পূর্ববঙ্গের মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। আর জন্ম হয় এক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে *বাংলাদেশোদয়ম্*

নাটক লোকানুরঞ্জনের অন্যতম মাধ্যম। একটি রচনাতে সবসময়ই তার পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতিফলন ঘটে থাকে। *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকটির রচনাকাল ও মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের ব্যবধান খুবই অল্প সময়ের। আর একজন ভারতবাসী হিসেবে কবি রামকৃষ্ণ শর্মা মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সাক্ষী। তাই এই নাটকটি প্রকৃতপক্ষে একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীর দক্ষতায়। এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় এই নাটকটি একটি সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে। নাটকটি পড়ে ৭১ এর পূর্ব বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি সামগ্রিক চিত্র পাই আমরা

সামাজিক ইতিহাস

সাহিত্য সবসময়ই সমাজের দর্পণ, সেখানে সামাজিক ব্যবস্থা অনায়াসে ধরা পড়ে। *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকের কবি রামকৃষ্ণ শর্মা বিস্তৃত রূপে যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন, তার তধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা পরিস্ফুট হয়েছে। ইতিহাসের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমাজ। এখানে তৎকালীন সমাজের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো নাটকটির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে-

নারীদের স্থান- *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকে নারীর ভূমিকা অবশ্য উল্লেখনীয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই নাটকের মুখ্য চরিত্র। এখানে নায়িকার চরিত্র চিত্রায়নে কবি সংস্কৃত নাটকের

চিরাচরিত প্রথা ভেঙেছেন। ন্যায়পরায়ণ, দৃঢ়চেতা, বিচক্ষণ, রাজনীতিবিদ্ হিসেবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা অসামান্য দক্ষতায় লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। দেশের চালক হিসেবে শান্তির পথ বেছে নেওয়ার পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই- এও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি অকপটে বলেন –

"অপতিষ্যতি চেদ্ যুদ্ধং নশ্শিরস্তু পুনস্ততঃ।

পঠিতব্যোঽধুনা কশ্চিদ্ পাঠঃ পাকায় মে মতি।।" [95]

তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষায় সদা তৎপর ছিলেন। তিনি বলেন, আগত শরণার্থীদের অতিথেয়তা করা ভারতের সনাতন ধর্ম-

'অয়ি বঙ্গবান্ধবাঃ, শরণাগতরক্ষা, অস্মাকং ভারতীয়ানাং সনাতনো ধর্ম ইতি কৃত্বা ভারতীয়সংসদা ভবন্তঃ অতিথিরূপেণ ব্যবহৃতা। অতিথিসৎকারোঽস্মাকং ধর্মাঙ্গঃ। '[96]

তিনি পূর্ব বাংলার স্ত্রীদের উপর হওয়া অত্যাচার দেখে শোকাকুল হয়েছেন। পাকিস্তানের অমানবিক ব্যবহার দেখে তিনি তিনটি প্রতিজ্ঞা নেন-

"মুজিবমোচনং প্রত্যাবর্তনং শরণার্থিনাম্।

লোকতন্ত্রস্থিতি চ বঙ্গে প্রতিজ্ঞাত্রিতয়ং ত্বিদম্।।" [97]

[95] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ১০৪

[96] তত্রৈব, পৃ. ১১২

[97] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ১১৬

এর পাশাপাশি কবি সেইসময়ের নারীদের দুর্দশার কথাও বর্ণনা করেছেন। পাকিস্তানের শাসকদের অত্যাচারে জর্জরিত পূর্ব বাংলার নারীদের করুণ আর্তনাদ কবির লেখনীতে যেন আরও মূর্ত হয়ে উঠেছে-

"বিকৃতরূপাঃ মহিলাস্তু কাশ্চিৎ

কাশ্চিচ্চ গর্ভানুপধারয়ন্ত্যঃ।

অন্যাঃ ক্ষতবিক্ষতকায়কাঃ বা

প্রাণষ্টশেষাস্তু বনেষু নির্গতাঃ।।"[98]

এছাড়াও সেই সময় নারীরা সুশিক্ষিত ছিল। তাদের কথোপকথন থেকে জানা যায় ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক সমস্ত দিক সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল।

মৈত্রীভাব - নাটকে মৈত্রীভাব শুধু যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দেখানো হয়েছে এমন নয়, দেশের সঙ্গে দেশেরও দেখা যায়। ব্যক্তিগত মিত্রতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আকীলা, রুকসানা এবং বন্দনার বন্ধুত্ব। যেখানে জাতি বা ধর্মের কোন বেড়াজাল ছিল না। আর ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের মিত্রতার কথা তো মজিবুরের কোথায় ফুটে ওঠে-

"গঙ্গা চ যমুনা যাবদ্ বঙ্গসিন্ধুহিমালয়ৌ।

বঙ্গভারতয়োর্মৈত্রী তাবৎ স্থাস্যতি ভূতলে।।"[99]

---

[98] তদেব

[99] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ২০৮

রাজনৈতিক চিত্র -

৭১ এর পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ, মুক্তিবাহিনী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, পিপল্স পার্টি প্রভৃতি সংগঠন ছিল। রাজনীতি প্রধান সমগ্র নাটকে রাজনৈতিক বাতাবরণ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ শোনা যায়। পাকিস্তানি মদ্যপ ব্যক্তি যেমন নেশাতুর অবস্থায় রাজনীতির আলোচনা করেছেন তেমনি পূর্ব বাংলার সাধারণ নারীরাও রাজনীতি নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন একে অপরের কাছে।

সংবিধান- মুক্তিযুদ্ধের সময় সংবিধানের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা দেখা যায়। পাকিস্তানী শাসকদের প্রতিকূল আচরণে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য মুজিবুর রহমান ষটসূত্রী সংবিধান রচনার প্রতিজ্ঞা করেন-

‘অধুনাহং বংগজনপ্রতিনিধিরূপেণ সাধিকারমুদ্ঘোষয়ামি যদ্ যদি পাকিস্তানস্য কিঞ্চিদ্ সংবিধানং রচ্যতে তদা তদ্ ষটসূত্রিকার্যক্রমে সমাধৃতং ভবিষ্যতীতি নিশ্চিতম্। মম তু জীবনং মরণঞ্চ দেশস্যৈব কৃতে ভবিষ্যতঃ। ’[100]

ষটসূত্রী সংবিধান, গণতন্ত্র, লোকতন্ত্র, উপনিবেশবাদ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থেকে এটা বোঝা যায় যে, সাধারণ নাগরিকেরা সংবিধান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

নির্বাচন ব্যবস্থা- শাসনকার্য পরিচালনার জন্য জনতার দ্বারাই প্রতিনিধিকে বেছে নেওয়া হয়। এই জনপ্রতিনিধি সাধারণ মানুষের হয়েই কাজ করে। *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই শুরু হয়। নির্বাচন ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বিশেষত

[100] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ৫০

আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা মুজিবুর রহমানের প্রতি পূর্ব বাংলার মানুষের আস্থা তাকে নির্বাচনে জয়লাভ করতে সাহায্য করে।

স্ত্রী শিক্ষা- *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার লক্ষণীয়। পুরুষের সমান শিক্ষার অধিকার মেয়েদেরও ছিল। তা সে গৃহকর্মের জ্ঞান হোক বা রাজনীতির জ্ঞান। নারীরা নিজেদের দেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আগরার এক বাসস্ট্যান্ডে একজন স্ত্রীলোকের সংবাদ পত্র পড়া থেকে এটা বোঝা যায় যে, নারীরা সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন -

'স্ত্রী সমাচারপত্রং নিশ্কাষ্য পঠিতুমারভতে।'[101]

এছাড়াও স্ত্রীলোকের একে অপরের সঙ্গে আলোচনায় তাদের ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়-

'বিবাহানন্তরস্তু ইয়মপি আকীলা স্বভর্ত্রা সহ তত্র লাহৌরে কারাচ্যাং পেশাবরে চ যথেচ্ছং বিহরিষ্যতে।'[102]

সঙ্গীত চর্চা- সঙ্গীত সবসময়ই আনন্দলাভের একটি অন্যতম মাধ্যম। *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকটি পড়ে এটা জানা যায় যে, সংগীতের বিভিন্ন দিকে বিকাশ হয়েছিল এবং ৭১ – এর বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবও পড়েছিল। নাটকে আমরা দেখি যে, পূর্ব বাংলার রাজ্যপাল এডমিরাল এহসানের মনোরঞ্জনের জন্য পাশ্চাত্য বেশভূষায় সজ্জিত নর্তকীরা এসে নৃত্য করে ও গান গায়-

---

[101] *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ১১৮

[102] তত্রৈব, পৃ. ৪০

'প্রবিশন্তি সুসজ্জিতাঃ ভোজ্য-ভক্ষপানাদিহস্তাঃ পাশ্চাত্যবেশভূষাসুসজ্জিতা কৈবরানর্তক্যঃ। বাদ্যবাদনং সুরাপানাদিকং নৃত্যঞ্চারভতে।'[103]

সন্ধ্যাকালীন অবসর যাপনেও মানুষেরা সঙ্গীতের ব্যবহার করতেন। এছাড়াও দেশাত্মবোধক সংগীত, নাবিকদের কণ্ঠে লোকগীতি প্রভৃতির ব্যবহার থেকে সঙ্গীত চর্চার দিকটি পরিস্ফুট হয়।

ধার্মিক ভাবনা- বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় শাখায় বিভক্ত। ধর্মীয় শাখাগত বৈচিত্র্য একটি দেশের সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে। *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকে আমরা দেখি পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধ ও সেই থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ। পূর্বপাকিস্তানে মুসলিম ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের মানুষও ছিল। আর তাই পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ প্রকট হয়ে ওঠে নাটকে। যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচার করে, ধর্মের দোহাই দিয়ে ভারতের বিরোধিতা করে। সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলে সাধারণ নাগরিক যদি ভালো না থাকে তবে সেই ধর্মের নামে দেশ চলেনা –

"বুভুক্ষিতৈর্ধর্মকথা ন ভুজ্যতে
ন শোষিতৈর্ভারত এব পীয়তে।
কাশ্মীরপ্রশ্নো ন কয়ামতঃ খলু
জেজীয়তে নৈব সদৈব ছদ্মনা।"[104]

---

[103] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ৩৪

[104] তত্রৈব, পৃ. ২৮

- **নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা -**

এবারে আসি নাটকটির নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনায়। সংস্কৃত আলংকারিকেরা তাঁদের গ্রন্থে নাটকের যে লক্ষণ করেছেন তা পর্যালোচনা করলে কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা পাই। বর্তমান অভিসন্দর্ভে নাট্যতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থ অনুসরণে। বিশ্বনাথ কবিরাজ তার গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নাটকের লক্ষণে বলেছেন, নাটককে 'খ্যাতবৃত্ত' হতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে খ্যাতবৃত্ত কি? উত্তরে তিনি বৃত্তিতে বলেছেন-

'খ্যাতং রামায়ণাদিপ্রসিদ্ধং বৃত্তম্।'[105]

আবার এই আদি পদের ব্যাখ্যায় টীকাকর হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বললেন-

'অত্রাদিপদেন মহাভারতাদীতিহাস-পুরাণ-লোকসমাজানাং গ্রহণম্।'[106]

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকটিকেও আমরা 'খ্যাতবৃত্ত' বলতেই পারি কারণ সাম্প্রতিক ইতিহাসকে আশ্রয় করেই নাটকটি লেখা হয়েছে।

সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন নাটকে পঞ্চসন্ধি থাকবে। সন্ধির সংজ্ঞায় তিনি বললেন-

'অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি।'[107]

এই সন্ধি মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহন ভেদে পঞ্চবিধ। সন্ধি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের অর্থপ্রকৃতি সম্পর্কে আগে জানতে হবে। কারণ। প্রকৃতি শব্দের অর্থ কারণ বা হেতু।

---

105 সা. দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫

106 তত্রৈব, পৃ. ৫

107 তত্রৈব, পৃ. ৪১

অর্থাৎ অর্থপ্রকৃতি শব্দের অর্থ হলো নাটকের প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির হেতু বা কারণসমূহ। অর্থপ্রকৃতয়ঃ প্রয়োজনসিদ্ধিহেতবঃ। এই অর্থ প্রকৃতিকে আলংকারিকেরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য। প্রতিটি রূপকে বীজ, বিন্দু এবং কার্যের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পতাকা ও প্রকরীর উপস্থিতি অনিবার্য নয়।

এবার আসি প্রথম প্রকার অর্থ প্রকৃতি অর্থাৎ বীজের আলোচনায়। অল্প ভাবে প্রদর্শিত হবার পর যে ঘটনা নাটকে পরে বহুভাবে বিস্তার লাভ করে সেই ঘটনাকেই নাটকীয় পরিভাষায় বীজ বলে। একটি বীজ থেকে প্রথমে জল সেচনাদির দ্বারা যেমন অঙ্কুর গজায় এবং সেই অঙ্কুর ধীরে ধীরে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি কোন ঘটনা নাটকের শুরুতে স্বল্প মাত্রায় প্রদর্শিত হয়ে পরে অন্যান্য অনেক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে ক্রমবিস্তৃত হয়ে যখন নায়কের মুখ্য ভালো লাভের প্রধান কারণ হয়, তাকেই বীজ বলে। আলংকারিক ধনঞ্জয়ের '*দশরূপক*' গ্রন্থের টীকার ধনিক মনে করেন বৃক্ষের বীজের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এরূপ নামকরণ হয়েছে-

'স্তোকোদ্দিষ্টঃ কার্যসাধকঃ পুরস্তাদনেকপ্রকারং বিস্তারী হেতুবিশেষো বীজবৎ বীজম্।'[108]

বাংলাদেশোদয়ম্ নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম শ্লোকে নাটকের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের মাতৃভূমির প্রতি আস্থা এবং দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যেই এই নাটকের বীজ-

''নমো বঙ্গভূম্যৈ নমো মাতৃভূম্যৈঃ।
নমো বাঙ্গলায়াঃ মহা সংস্কৃতিভ্যঃ।।
নমো বৈ নবপ্রস্ফুরচ্চেতনাভ্যঃ।

[108] *দশরূপকম্*, সম্পা. আচার্য ও দাস, পৃ. ২৫

নমঃ সর্বতো মানবী ভাবনাভ্যঃ।।"[109]

কোন আনুষঙ্গিক কর্মের দ্বারা নাটকের মূল ইতিবৃত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তবে তাকে পুনরায় ধারাবাহিকতা দেওয়াই হল বিন্দু। বর্তমান নাটকে তৃতীয়াঙ্কে বন্দনা, রুকসানা ও আকীলার কথোপকথন নাটকের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু পরক্ষণেই সেখানে বশীর এসে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নির্বাচনে জয় ঘোষণা করে, যা পুনরায় নাটকের কাহিনীকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনে-

'(সহর্ষম্) আগত-আগত এষ বিজয়জুলুসঃ। সাবধানাঃ বয়মপি জয়ঘোষং কুর্মঃ অস্মাকং নেতা বঙ্গবন্ধু...সর্বে জয়তাৎ।

(যাবত্তে ত্রিবারং জয়ঘোষং কুর্বন্তি তাবৎ প্রবিশতি ধৃতবহুপুষ্পজয়মালঃ জনৈরনুগম্যমানঃ শেখমুজীবুররহমানঃ)।'[110]

নাটকে যে ঘটনা প্রধানরূপে প্রতিপাদ্য অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাটক আরম্ভ হয়, তা সিদ্ধ হওয়াকেই কার্য্য বলে। এক কথায় বলা যায় নাটকের ফলই হল কার্য্য। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকে বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশই হল কার্য্য অর্থাৎ নাটকের মুখ্য ফল -

"বংগভারতলোকানাং রক্তেন সিঞ্চিতা ত্বিয়ম্।

স্বতন্ত্রতা হি বংগস্য জীবতাজ্জয়তাৎ সদা।"[111]

---

[109] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ৬

[110] তত্রৈব, পৃ. ৪৬

[111] তত্রৈব, পৃ. ২০৮

আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম ভেদে এই কার্য্যের আবার পাঁচটি অবস্থার কথাও সাহিত্য সমালোচকেরা বলেছেন। কোন কার্য্য বা নাটকের মূল ইতিবৃত্তে মানব জীবনেরই প্রতিফলন ঘটে থাকে। ব্যস্ত জীবনে মানুষকে যেমন বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সাফল্যের পথে এগোতে হয়, ঠিক তেমনি নাটকের নায়ককেও তার ইপ্সিত ফললাভের জন্য বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। নায়কের এই প্রচেষ্টার পাঁচটি স্তরই হল নাটকীয় পরিভাষায় পঞ্চ কার্য্যাবস্থা। এই অবস্থা গুলি নাটকের ইপ্সিত ফললাভকে ত্বরান্বিত করে। দশরূপককার ধনঞ্জয়ের ভাষায়-

"অবস্থাঃ পঞ্চ কার্যস্য পারদ্ধস্য ফলার্থিভিঃ ।

আরম্ভ-যত্ন- প্রাপ্ত্যাশা-নিয়তাপ্তি- ফলাগমঃ।।"[112]

আরম্ভ-

নাটকীয় কথাবস্তুর অগ্রগতির প্রথম অবস্থা হল আরম্ভ। বস্তুতঃ এটি হল কার্যের সূচনাংশ। এই অবস্থায় বিশেষ ফললাভের জন্য নাটকের প্রধান চরিত্রের অভিলাষ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়। বিশ্বনাথ বলেন-

'ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে।'[113]

বাংলাদেশোদয়ম্ নাটকের নায়ক মুজিবুর রহমান কথিত-

'মম জীবনস্যৈতে নমস্কারাঃ সন্তি সমর্পিতাঃ। ভবতু নাম প্রকারবৈবিধ্যম্।'[114]

---

[112] *দশরূপকম্*, সম্পা. আচার্য ও দাস, পৃ. ২৯

[113] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪০৪

[114] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ৬

যত্ন- 'প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ।'[115] নাটকের মুখ্য ফললাভের জন্য নায়ক বা নায়িকার যে প্রয়াস, তাকেই বলে প্রযত্ন। লক্ষনস্থিত ত্বরা শব্দের অর্থ ব্যাগ্রতা বা ঔৎসুক্য, যা আরম্ভের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। কিন্তু প্রযত্নে সেই ঔৎসুক্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য অতিত্বরান্বিত প্রয়াস থাকে। বর্তমান নাটকের মুখ্যফল বাংলাদেশের মুক্তি । আর এই ফললাভের জন্য নাটকের প্রথমাঙ্ক থেকে অষ্টমাঙ্ক পর্যন্ত প্রয়াস চলে। তাই এই অংশটুকুই নাটকের প্রযত্ন।

প্রাপ্ত্যাশা-

প্রাপ্ত্যাশা শব্দটির মধ্যেই এর অর্থ লুকিয়ে আছে। প্রাপ্তির আশাই হল প্রাপ্ত্যাশা। প্রাপ্ত্যাশা নামক কার্যাবস্থার লক্ষণাবসরে ধনঞ্জয় বলেছেন –

'উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ।'[116]

উপায় অর্থাৎ ফললাভের হেতুর অস্তিত্ব থাকলেও, অপায় অর্থাৎ আশঙ্কা উপস্থিত হলে, এই আশা-নিরাশার দোলাচলকেই প্রাপ্ত্যশা বলা হয়েছে নাট্যতত্ত্বের পরিভাষায়। অর্থাৎ দোলাচল থাকলেও সেখানে প্রাপ্তির সম্ভাবনা অধিক থাকে। উদাহরণ স্বরূপ *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকের পঞ্চম থেকে শুরু করে অষ্টম অঙ্কের 'প্রাণনাশে সমাপন্নে বিজয়াশা তু কিদৃশী।'[117] – এই পর্যন্ত অংশ হল প্রাপ্ত্যাশা।

নিয়তাপ্তি-

---

115 সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৫০৫

116 *দশরূপকম্,* সম্পা. আচার্য ও দাস, পৃ. ৩২

117 *বাংলাদশোদয়ম্,* পৃ. ৮০-১৬০

অনন্তর নিয়তাপ্তির লক্ষণ বলা হচ্ছে। নিয়তাপ্তির দশরূপকোক্ত লক্ষণটি হল-

'অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিঃ সুনিশ্চিতা।'[118]

বাধার অভাবে ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হলে নিয়তাপ্তি হয়। প্রাপ্ত্যাশা নামক তৃতীয় অবস্থায় সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তার দোলাচল থাকে। কিন্তু নিয়তাপ্তি তে প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়। বর্তমান নাটকের নবম অঙ্কে পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে ভারতের কাছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ভারতদূতের কাছে সন্ধিপত্রে হস্তাক্ষর করে দেয়। এইভাবে সমস্ত দূর হওয়ার মধ্যে দিয়ে ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়।

ফলাগম-

নাটকীয় ক্রিয়ার পঞ্চম এবং সর্বশেষ অবস্থার নাম হল ফলাগম বা ফলপ্রাপ্তি। বিশ্বনাথ প্রদত্ত ফলাগমের লক্ষণটি নিম্নরূপ-

'সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ।'[119]

যে অবস্থায় সমস্ত অভিপ্রেত ফলের আগম সেই অংশকে নাট্যতত্ত্ববিদরা ফলাগম বলেছেন। *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকের দশম অঙ্কে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মান্যতা দিলেন সেই অংশেই নাটকের মুখ্য ফল লাভ হয়েছে। তাই তা ফলাগম নামক পঞ্চম কার্য্যাবস্থা।

---

118 *দশরূপকম্,* সম্পা. আচার্য ও দাস, পৃ. ৩৩

119 সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪০৬

পূর্বোক্ত পাঁচটি অর্থ প্রকৃতির সঙ্গে পঞ্চ কার্য্যাবস্থার মিলনে যথাক্রমে পঞ্চ সন্ধির উদ্ভব হয়। সেগুলি যথাক্রমে- মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ বা অবমর্ষ এবং নির্বহন বা উপসংহৃতি। দশরূপকার ধনঞ্জয়ের দৃষ্টিতে-

বীজ + আরম্ভ = মুখসন্ধি

বিন্দু + যত্ন = প্রতিমুখসন্ধি

পতাকা + প্রাপ্ত্যাশা = গর্ভসন্ধি

প্রকরী + ফলাগম = নির্বহন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে সন্ধি কি? এক কথায় সন্ধি কথাটির অর্থ হল সংযোগ। নাটকের কথাবস্তু নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ক্রমশ মুখ্য ফলের পথে অগ্রসর হয়। এই এক একটি ধাপই হল সন্ধি। আলংকারিক বিশ্বনাথ প্রদত্ত সন্ধির লক্ষণটি হল-

'অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি।'[120]

লক্ষণটির বাংলা তর্জমা করলে দেখা যায় যে, একটি মূল প্রয়োজনের সঙ্গে অন্বিত কথাবস্তুর অবান্তর অপর একটি প্রয়োজনরূপ সম্বন্ধকে সন্ধি বলা হয়। এবার দেখে নেওয়া যাক '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকে পঞ্চ সন্ধির উপস্থিতি।

মুখ সন্ধি-

মুখ সন্ধিতে মুখ কথার অর্থ আরম্ভ। নাটকের যে অংশে নানা রসান্বিত বীজের উৎপত্তি হয় এবং তা আরম্ভ নামক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাকেই মুখসন্ধি বলে। '*বাংলাদেশোদয়ম্*'

---

[120] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪০৭

নাটকের প্রথমাঙ্কে- ‘নমো বঙ্গভূম্যৈ নমো মাতৃভূম্যৈ।’[121] – মুজিবের এই উক্তি পর্যন্ত অশংটি মুখসন্ধি। কারণ এখানে মুজিবের দেশকে স্বাধীন করার আস্থা রূপ বীজ এবং ঔৎসুক্যরূপ আরম্ভ নামক অবস্থার সংযোগ ঘটেছে।

প্রতিমুখসন্ধি -

বীজ কোথাও লক্ষিত অবস্থায় কোথাও বা অলক্ষিত অবস্থায় উপন্যস্ত হলে প্রতিমুখসন্ধি হয়। এখানে বিন্দু নামক অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে প্রযন্ত নামক অবস্থার সংযোগ ঘটে। মুখসন্ধিতে যে বীজ উপন্যস্ত হয় প্রতিমুখ সন্ধিতে তা কিছুটা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই সন্ধিতে কখনো প্রতিকূল অবস্থার উপস্থাপনার হলে মুখ্য ফললাভের প্রতি আশঙ্কা তৈরি হয়, আবার কখনো অনুকূল পরিস্থিতি আসায় বীজের প্রকাশে যত্ন দেখা যায়। *বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকের প্রথমাঙ্কের- অস্মাকং অবামীলীগঃ জনসামান্য....থেকে শুরু করে চতুর্থ অঙ্কের শেষ পর্যন্ত ঘটনা প্রতিমুখসন্ধি। কারণ প্রথমাঙ্কে মুজিবের উক্তিতে যে বীজ উপন্যস্ত হয় তৃতীয় ও চতুর্থাঙ্কে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তা কিছুটা অলক্ষিত হলেও স্থানে স্থানে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরীর প্রযত্নও দেখা যায়।

গর্ভসন্ধি-

বিশ্বনাথ উক্ত গর্ভ সন্ধির লক্ষণটি হল-

“ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।

গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ।।”[122]

---

[121] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ৬

[122] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪০৯

প্রতিমুখ সন্ধিতে সাধারণভাবে অঙ্কুরিত বীজের পুনঃ পুনঃ হ্রাস ও অন্বেষণের মাধ্যমে উদ্গম হওয়াকে গর্ভসন্ধি বলে। নাটকের ফলকে গর্ভে পোষণ করার থেকেই এই রূপ নামকরণ। প্রতিমুখ সন্ধিতে কখনো লক্ষ্যে থেকে বা কখনো অলক্ষ্যে থেকে বীজের ঈষৎ উদ্গম হয়। আর সেই বীজেরই বিকাশ সাধিত হয় গর্ভসন্ধিতে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বীজের আবির্ভাব হয়, পুনরায় তা আবার অন্তর্হিত হয় এবং তার জন্য অন্বেষণ চলে।

অর্থাৎ এখানে ফলপ্রাপ্তির ভাষা নিশ্চিত না হলেও সাফল্যের সম্ভাবনা অধিকতর স্পষ্ট হয়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই সন্ধিতে পতাকা নামক অর্থপ্রকৃতি ও প্রাপ্ত্যাশা নামক কার্য্যাবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পতাকার উপস্থিতি সর্বদা না হলেও প্রাপ্ত্যাশার উপস্থিতি অনিবার্য। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটক ষষ্ঠ অংক থেকে শুরু করে অষ্টম অংকের - 'মিত্রকৈরপি যদ্দেতৎ নূনং মানবতা মৃতা।'[123] - এই পর্যন্ত অংশ গর্ভসন্ধির উদাহরণ।

বিমর্ষসন্ধি-

এবার বিমর্ষ সন্ধির আলোচনা করা যাক। বিমর্ষ সন্ধিতে প্রধান ফলপ্রাপ্তির উপায় গর্ভ সন্ধি অপেক্ষা অধিকতর বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হয়। দশরূপকার ধনঞ্জয় একে অবমর্ষ বলেছেন। নিয়তাপ্তি নামক কার্য্যাবস্থা এবং প্রকরী নামক অর্থপ্রকৃতির সংযোগ থাকে এই সন্ধিতে। প্রকরী সমস্ত নাটকে নাও থাকতে পারে কিন্তু নিয়তাপ্তি এই সন্ধিতে অবশ্য লক্ষণীয়।

'*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকে অষ্টম অঙ্ক থেকে শুরু করে নবম অঙ্কের শেষ পর্যন্ত বিমর্ষ সন্ধির ক্ষেত্র।

[123] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ৯৮-১৭৪

নির্বহণসন্ধি-

সর্বশেষ এবং পঞ্চম নাট্য সন্ধি হল নির্বহণসন্ধি বা উপসংহৃতি। মুখাদি চারটি সন্ধিতে উপন্যস্ত বীজ যে স্থানে এসে সুসংহত অর্থে উপনীত হয়, সেই সন্ধিকেই বলা হয় নির্বহণ সন্ধি। যেখানে সমস্ত অন্তরায় তিরোহিত হওয়ায় নাটকের মুখ্য ফল সাধিত হয়। নাট্যতত্ত্ববিদ্ ধনঞ্জয় নির্বহণ সন্ধির লক্ষণ নির্ণয়াবসরে বলেছেন-

"বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।

ঐকার্থ্যমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।।"[124]

বাংলাদেশোদয়ম্ নাটকের দশম অঙ্কের সম্পূর্ণ অংশই নির্বহণ সন্ধির দৃষ্টান্ত।

সাহিত্য সমালোচকদের মতে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যকাব্যে পাঁচটি সন্ধির উপস্থিতি অনিবার্য। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে একদিকে যেমন একই অঙ্কে দুই বা ততোধিক সন্ধির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, ঠিক তেমনই আবার একটি সন্ধির ব্যপ্তি একাধিক অঙ্কেও দেখা যায়। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকেও আমরা দেখি যে একটি সন্ধির অবস্থান দুই বা ততোধিক অঙ্ক জুড়ে রয়েছে।

এছাড়াও একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের আরো যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নাটকটিতে দেখা যায় তা ক্রমে আলোচিত হবে। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের সুদীর্ঘ ইতিহাসরেখা অনুধাবন করলে রস, গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতি কয়েকটি তত্ত্বের সন্ধান আমরা পাই। এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি তত্ত্বের আলোচনা করব সংস্কৃত কাব্যতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে। প্রথমেই আসি রসের প্রসঙ্গে।

[124] *দশরূপকম্*, সম্পা. আচার্য ও দাস, পৃ. ১১৪

ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ প্রবর্ততে

আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা কাব্য পাঠ করি। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে কি এই আনন্দ? খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে কোন কাব্য পাঠের পর সেই কাব্যের রেশ যখন আমাদের চেতনাকে দীর্ঘক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে তাই হল রস। কাব্য পাঠ করে রসানুভূতি হয় বলেই আমরা আনন্দ লাভ করে থাকি।

রস্ ধাতু থেকেই 'রস' শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ আস্বাদন যোগ্য। এক কথায় কাব্য বা সাহিত্য পাঠে আমরা যা আস্বাদন করি তাই রস। কবির এই রসানুভূতি থেকেই কাব্যের জন্ম। আর সহৃদয়ের রসানুভূতিতেই কাব্যরচনার সার্থকতা। ভরতমুনি তাই রসের আলোচনার শুরুতেই বলেছেন-

'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ প্রবর্ততে।'[125]

রস ব্যতীত কোন বিষয়ই প্রবর্তিত হয় না। এরপরেই তিনি বললেন-

'তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।'[126]

এটি 'রসসূত্র' নামে পরিচিত। এই বাক্যটিই রসবাদের ভিত্তি। পরবর্তীকালে এই একটি সূত্রের ব্যাখ্যাই অনেক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। ভরতাচার্য বললেন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে স্থায়িভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনব গুপ্ত এই সূত্রটিকে উপজীব্য করে লোল্লট প্রভৃতি বিভিন্ন আলংকারিকদের মতের বিশদ আলোচনা

[125] না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৭
[126] তদেব

করেছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রবেশের আগে আমাদের জানতে হবে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব বলতে কি বোঝায়।

বিভাব -

বিভাব শব্দের অর্থ কারণ। অর্থাৎ রসানুভূতির কারণই হল বিভাব। লৌকিক জগতের সমস্ত কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য। শোক, হাস, ভীতি প্রভৃতি ভাবগুলি যখন কাব্যে নিবেশিত হয় তখনই তাদের বিভাব বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রে এই বিভাবের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

"বহবোঽর্থাঃ বিভাব্যন্তে বাগঙ্গাভিনয়াশ্রিতাঃ

অনেন যস্মাত্তেনায়ং বিভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ।।"[127]

এই বিভাব আবার আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে দ্বিবিধ। যে বিষয়কে অবলম্বন করে আমাদের চিত্তে রসানুভূতি হয়, তাকেই আলম্বন বিভাব বলে। আর যে সব বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্থায়িভাবের উদ্দীপনায় সহায়ক হয়, তারাই উদ্দীপন বিভাব নামে পরিচিত।

অনুভাব-

অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ। অনুভাবের অর্থ হলো চিত্তগত ভাবের প্রকাশ। যেমন প্রিয়জনের মৃত্যুতে অশ্রু নির্গত হওয়া বা ভয়ার্ত হলে শরীরের কম্পন প্রভৃতি আচরণ যদি কাব্যে বর্ণিত হয়, তবে তা অনুভাব আখ্যা পেয়ে থাকে। বিশ্বনাথোক্ত অনুভাবের লক্ষণটি নিম্নরূপ-

"উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।

[127] না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৫৪

লোকে সঃ কার্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।।"[128]

ব্যভিচারিভাব-

ব্যভিচারী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে স্থায়িভাবের অভিমুখে গমন করা। এর অপর নাম সঞ্চারিভাব। ব্যভিচারিভাবের ব্যাখ্যানাবসরে আলংকারিক শারদাতনয় তাঁর '*ভাবপ্রকাশন*' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রাণিধানযোগ্য-

"উন্মজ্জন্তো নিমজ্জন্তঃ কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে

তস্যোৎকর্ষং বিতন্বন্তি যান্তি তদ্রূপতামপি।

স্থায়িন্যুমগ্ননিমগ্নাস্তথৈব ব্যভিচারিণঃ

পুষ্ণন্তি স্থায়িনং স্বাংশ্চ তত্র যান্তি রসাত্মকম্।।"[129]

অর্থাৎ সমুদ্রবক্ষে যেমন তরঙ্গরাজি একবার উত্থিত হয়, আবার নিমর্জ্জিত হয় তেমনি ব্যভিচারিভাবগুলি ক্রমাগত স্থায়িভাবের মধ্যে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হয়। এই তিন প্রকার ভাবের পরিচয় আমরা ভরতের রসসূত্রে পাই। তিনি রস সূত্রে বলেছেন পূর্বোক্ত তিন প্রকার ভাবের সঙ্গে সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু এই সংযোগ কার সঙ্গে হবে তা তিনি স্পষ্ট করেননি। টীকাকার অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানতে পারি যে এই সংযোগ হয় স্থায়িভাবের সঙ্গে। তাই রসসূত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য এবার আমাদের স্থায়িভাব কি তা জানতে হবে।

128 সা. দ. সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৯৬

129 *ভাবপ্রকাশন*, ১ম অধিকার

স্থায়িভাব-

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমাদের চিত্তে যে বাসনা বা প্রবৃত্তিগুলি নিয়তই গূঢ়ভাবে বর্তমান থাকে সেগুলিই নাট্য তাত্ত্বিকদের মতে স্থায়িভাব। আলংকারিক গণ তাদের ব্যাখ্যায় নয়টি স্থায়িভাব স্বীকার করেছেন- রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। বিশ্বনাথ কবিরাজ ভাব গুলিকে আস্বাদ্যমান অঙ্কুরের মূল বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এইভাবগুলিরই রসে পর্য্যবসান ঘটে। এদের থেকেই রসের সৃষ্টি হয় -

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।

আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ।।"[130]

আচার্য অভিনবগুপ্ত ভরতের এই রসসূত্রের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বাভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। রসসম্পর্কিত তাঁর মতবাদ অভিব্যক্তিবাদ নামে সর্বজনপ্রসিদ্ধ। তিনি পরবর্তীতে '*ধ্বন্যালোক*' গ্রন্থের লোচন টীকায় রসাভিব্যক্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল - 'শব্দসমর্প্যমানহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিতপ্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্ব সংবিদানন্দচর্বনব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ।'[131]

এবারে আসি রসের ভেদ প্রসঙ্গে । নাট্যশাস্ত্রকার ভরত আটটি রস স্বীকার করেছেন । কিন্তু পরবর্তীতে মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলংকারিকেরা রসের নয়টি ভেদ স্বীকার করেছেন। যথা শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। নাটকে রসের বিদ্যমানতা

---

130 সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২২৬

131 *ধ্বন্যালোক*, পৃ. ৩৫

সমস্ত আলংকারিকেরাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। একটি নাটকের মূলীভূত রসকে নাটকীয় পরিভাষায় অঙ্গীরস বলা হয়। আর তাছাড়াও এই অঙ্গীরসের পরিপুষ্টি বিধানের জন্য অন্যান্য সহায়ক রসের উপস্থিতিও অনুভূত হয়, সেগুলি অঙ্গরস হিসেবে পরিচিত। নাটকে প্রধানত শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্তরস অঙ্গীরস হিসেবে গণ্য হয় বলে বিশ্বনাথের মত-

“এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।

অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্।।”[132]

বাংলাদেশোদয়ম্ নাটকের রসবিমর্শ

বাংলাদেশোদয়ম্ নাটকের অঙ্গীরস ‘বীর’। বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহ। এই উৎসাহ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে সংযোগে ক্রমশ উদ্দীপ্ত হয়ে বীররসে পর্য্যবসিত হয়।

বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহ, দেবতা মহেন্দ্র এবং এই রস সুবর্ণাভাবিশিষ্ট। বিজেতব্য অর্থাৎ শত্রু হল আলম্বন বিভাব। শত্রু প্রভৃতির চেষ্টা হল উদ্দীপন বিভাব। সহায়, অন্বেষণ প্রভৃতি হল অনুভাব এবং ধৃতি, মতি, গর্ব, স্মৃতি, তর্ক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি হল ব্যভিচারিভাব। দান, ধর্ম, যুদ্ধ ও দয়া ভেদে নাট্যতাত্ত্বিকেরা বীররসের চারপ্রকার ভেদ করেছেন। ‘*বাংলাদেশোদয়ম্*’ নাটকের প্রেক্ষাপট যেহেতু যুদ্ধ, তাই এখানে যুদ্ধবীর-ই প্রধানভাবে অনুভূত হয়। বর্তমান নাটকে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী হল আলম্বনবিভাব এবং পাকসেনাদের প্রতাপ, পরাক্রম, নীতি প্রভৃতি হল উদ্দীপনবিভাব। যুদ্ধবীরে সহায় অর্থাৎ সহকারী হল সৈন্য। ভারতীয় সেনাদের অমর্ষ, গর্ব প্রভৃতি হল ব্যভিচারিভাব। আলোচ্য নাটকের সপ্তমাঙ্কে ভারতীয়

[132] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৬৮

সৈনিকেরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আপন প্রাণের মোহ ত্যাগ করে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে-

"ততঃ ফেনীং বিজিত্যতে চটগাংবোন্মুখা ননু।
যত্রাধুনা মহদ্ যুদ্ধং প্রচলদ্ বর্ততে খলু।।"[133]

এই অংশটু 'যুদ্ধবীর' - এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ এখানে পাকিস্তানের সৈন্যরাজি অর্থাৎ প্রতিপক্ষ হল আলম্বন বিভাব। প্রতিপক্ষের অর্থাৎ শত্রুপক্ষের চেষ্টা অর্থাৎ দ্বেষ উৎপাদন করা হল উদ্দীপন বিভাব। যুদ্ধে সহায় অর্থাৎ সহকারী হল সৈন্য। যুদ্ধকালীন ভারতীয় সৈন্যদের যে রোমাঞ্চ, যুদ্ধে জয়লাভের যে গর্ব, হর্ষ প্রভৃতি হল ব্যভিচারিভাব। এই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব গুলি সৈন্যদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং এই উৎসাহ-ই বীর রসের উদ্রেক ঘটিয়েছে। এছাড়াও অষ্টমাঙ্কে যেখানে পাকিস্তানী সেনারা পরাজিত হচ্ছে তবুও ইয়াহিয়া খান তাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করতে আদেশ দিচ্ছেন। এটি প্রকৃতই যুদ্ধবীরের দৃষ্টান্ত-

"যাহ্যাখ্যানস্য সদ্যঃ সম্প্রাপ্তসন্দেশোঽয়ম্, যাবৎ পূর্ববংগালে কেবলং ঢাকা, তত্রাপি একমপি সৈন্যশিবিরম্। নাগরিকগৃহস্বা, তত্রাপি চৈকোঽপি পাকসৈনিকঃ তস্য চৈ কোঽপি বা শ্বাসলেশঃ তাবদ্ যুদ্ধং প্রচাল্যতাম্ প্রচাল্যতাম্ প্রচাল্যতামিতি।।" [134] অর্থাৎ এখনই ইয়াহিয়া খানের আদেশ এসেছে যে, পূর্ববঙ্গে যদি একটিও সৈন্যশিবির থাকে এবং সেখানে যদি একজনও পাকসৈনিক থাকে তবে সেই সৈনিক যেন তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত

---

133 *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ১৩৮

134 তত্রৈব, পৃ. ১৫২

যুদ্ধ জারি রাখে। এই ভাবেই সমগ্র নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন ও কার্যকলাপের মধ্যে বীর রসের অনুভূতি হয়ে থাকে দর্শকচিত্তে।

নাটকে অনুভূত অঙ্গরসরাজির পরিচয়

কাব্যে ও অঙ্গীরসের পরিপোষণের জন্য অঙ্গরসের উপস্থিতি অনিবার্য। যেকোনো একটি রস সমগ্রনাটক জুড়ে অনুভূত হতে পারে না। কারণ নাটক মানবচিত্তের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু না। আর মানবমনে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। ঠিক একইভাবে 'বাংলাদেশোদয়ম্' নাটকে অঙ্গীরস বীরের সাথে সাথে তার সহায়ক হিসেবে হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়ানক, শান্ত প্রভৃতি রসেরও বর্ণনা করেছেন নাট্যকার। এখানে সেই অঙ্গরসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

হাস্যরস- হাস্যরসের সাহিত্যদর্পণবিধৃত লক্ষণটি হল-

"বিকৃতাকার বাগ্বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ ভবেৎ।

হাস্যো হাসস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ।।"[135]

আকার, কথাবার্তা, বেশভূষা ও চেষ্টা প্রভৃতির বিকৃতি থেকে মানবচিত্তে যে হাস ভাবের উদ্রেক হয় সেখান থেকেই হাস্যরসের উৎপত্তি। ওষ্ঠদংশন, নাসিকা ও গণ্ডস্থলের কম্পন, নেত্রকুঞ্চন, মুখরাগ, পার্শ্বদেশে হস্তস্থাপন ইত্যাদি অনুভাবের দ্বারা হাস্যরসের অভিনয় করণীয়। অবহিত্থা, হর্ষ, উৎসাহ, বিস্ময় ইত্যাদি হাস্যরসের ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব হল হাস

[135] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৫২

আর এর অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন প্রমথ। এই হাস্যরসের দুইটি প্রকার- আত্মস্থ ও পরস্থ। যখন কেউ নিজে হাসে তখন তা আত্মগত, আর যখন অপরকে হাসায় তখন তা পরগত-

'দ্বিবিধাশ্চয়মাত্মস্থঃ পরস্থশ্চ। যদা স্বয়ং হসতি তদাত্মস্থ। যদাপরং হাসয়তি তদা পরস্থঃ।'

এই হাস্যরস উত্তম, মধ্যম ও অধম পাত্র বিশেষে স্মিত, হসিত, বিহসিত, উপহসিত, অপহসিত ও অতিহাসিত ভেদে ষড়বিধ।

বাংলাদেশোদয়ম্' নাটকের প্রথমাঙ্কে গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের কথোপকথনে হাস্যরসের পরিচয় পাই আমরা। এছাড়াও নবমাঙ্কে পাকিস্তানী জনপ্রতিনিধির সমাচার শুনে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে হাসতে থাকে -

"চৌহ্বানশ্চলিতঃ স্থানাৎ নির্গতো জগজীবনঃ।
করণাসিংহস্ত নির্গূঢ়ো হিমবৎ কন্দরান্তরে।।"[136]

বীভৎস রস- অনন্তর বীভৎস রসের আলোচনা। অপ্রিয়, অপবিত্র ও অনিষ্টকর বিষয়ের শ্রবণ দর্শন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা এই রস উৎপন্ন হয় । এই বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত অনুবংশ্য শ্লোকটি হল-

"অনভিমতদর্শনেন চ রসগন্ধস্পর্শশব্দদোষৈশ্চ।
উদ্বেজনৈশ্চ বহুভির্বীভৎসরসঃ সমুদ্ভবতি।।"[137]

---

136 সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৮৬

137 না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৫০

এই রসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা। মুখ-চোখের সংকোচন, নাসিকাচ্ছাদন, অবনত মুখ, উদ্বেগ প্রভৃতি হল অনুভাব এবং অপস্মার, আবেগ, মোহ, রোগ ও মারণাদি হল ব্যভিচারিভাব। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে পাকিস্তানী সৈনিকদের দ্বারা পূর্ববাংলার অসহায় মানুষদের উপর করা নৃশংস অত্যাচার বীভৎস রসের উদাহরণ –

'তত্র তু সৈনিকযানপিংশিতেস্তুণ্ডৈঃ মুণ্ডৈশ্চ সস্রবদ্রক্তৈঃ প্রতোলী পঙ্কিলতামায়াতা।'[138] অর্থাৎ সেখানে সৈনিকদের গাড়ির চাকায় ক্ষতবিক্ষত নরদেহ ও নরমুণ্ডের রক্তধারায় রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে গেছে।

এছাড়াও ষষ্ঠাঙ্কে এক শরণার্থীর ভয়ার্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে জানা যায়, পাকিস্তানী সৈনিকরা বাঙ্গালীদের ঘরে প্রবেশ করে গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীকে মেরে তাঁদের শরীর থেকে মাংস খন্ড বের করে ফেলে, কখনো বা রক্ত বন্যা বইয়ে দেয়, আবার কখনো অস্থি খণ্ডবিখণ্ড করে দেন-

''কুত্রাপি চেত্তৎ প্রতিরোধকর্তা।

গৃহস্য স্বামী মহিলাদয়ো বা।।

তান্ শস্ত্রাঘাতেন তথা বিকুর্বতে।

মাংসঃ ক্ব রক্তং ক্ব ক্ব চাস্থিসঙ্ঘঃ।।''[139]

[138] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ৮৬

[139] তত্রৈব, পৃ. ১১৪

অর্থাৎ কোন গৃহের গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী যদি পাকসৈনিকদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তবে সৈনিকেরা শস্ত্রাঘাতে তাদের শরীর থেকে মাংসখণ্ড ছিঁড়ে নিচ্ছে এবং অস্থি খণ্ডবিখণ্ড করছে।

করুণরস - দশরূপককার ধনঞ্জয় করুণরসের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে বলেছেন-

'ইষ্টনাশাদনিষ্টপ্রাপ্তৌ শোকাত্মা করুণোঽনুত্তম্'[140]

ইষ্টজনের অর্থাৎ প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগ এবং অনিষ্ট প্রাপ্তি অর্থাৎ অপ্রিয় বস্তুর কারণে চিত্তে যে শোক উৎপন্ন হয় তার-ই পরিপুষ্ট রূপ হল করুণরস। এই রসের স্থায়িভাব হল শোক। নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, রোদন, স্তম্ভ প্রবৃতি হল অনুভাব এবং নিদ্রা, দৈন্য , ব্যাধি, আলস্য, বিষাদ, জড়তা, চিন্তা প্রভৃতি এই রসের ব্যভিচারিভাব। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারে জর্জরিত বাঙ্গালীদের আর্তনাদ সহৃদয়বর্গকে আকুল করে তোলে- 'মাংহমাংগো (সসীৎকারম্) আহ, আহ, মোরে গেলাম্ মোরে গেলাম্ মোরে...মোরে গেলাম্ আ...আ।'[141] এছাড়া অষ্টমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পরাজিত, মৃত্যুভয়ে ভীত পাকিস্তানী সেনাদের বিলাপে করুণ রসের উদ্রেক হয়। যেমন-

"হা তাত হা পিতর্মাতর্হা বন্ধো পশ্চিমে স্থিতাঃ।

নাধুনা মেলনং ভাব্যং কিং কুর্মো কিং করোমি বা।।"[142]

---

[140] *দশরূপকম্*, সম্পা. আচার্য ও দাস, পৃ. ২২৬

[141] *বাংলাদেশোদয়ম্*, ৯৬

[142] তত্রৈব, পৃ. ১৫৪

এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে যে রসানুভূতি মানেই আনন্দ। কিন্তু শোকানুভব থেকে কিভাবে আনন্দ লাভ হতে পারে? এই আশঙ্কার সমাধানে বিশ্বনাথ বলেছেন-

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।।"[143]

কারণ লৌকিক জগতের যে সমস্ত বিষয় দুঃখের কারণরূপে বিবেচিত হয়, সেই বিষয়ই যখন কাব্যে বা নাটকে বর্ণিত হয়, তখন তা অলৌকিক বিভাবে রূপান্তরিত হয়। আর তাই-ই লৌকিক জগতের দুঃখের কারণও অলৌকিক কাব্যজগতে সুখকর হয়ে ওঠে।

ভয়ানক রস- ভয় উদ্রেককারী শব্দ শ্রবণে অথবা ভয়ঙ্করাকৃতি প্রাণী দর্শনে ভয় নামক স্থায়িভাব ভয়ানক রসে পরিপুষ্ট হয়। এই রসের অনুভাব হল সর্বাঙ্গের কম্পন, স্বেদনির্গমন, মুখের শুষ্কতা, বিবর্ণভাব প্রভৃতি। আর দৈন্য, ত্রাস, সম্ভ্রম ইত্যাদি হল ব্যভিচারিভাব। ভয়ানক রসের স্বরূপ নির্ণয়াবসরে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন-

"বিকৃতরবসত্ত্বদর্শনসংগ্রামারণ্যশূন্যগৃহগমনাৎ।

গুরুনৃপয়োরপরাধাৎ কৃতকশ্চ ভয়ানকো জ্ঞেয়ঃ।।"[144]

'*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে যেখানে পাকিস্তানী সৈনিকরা পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীদের গৃহে প্রবেশ করে অমানবিক আচরণ করতে থাকে, তখন ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালীরা আশ্রয়ের জন্য

[143] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. পৃ. ১৪৯

[144] না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৯

ভারতে পালিয়ে আসতে শুরু করে এবং আর্তস্বরে চিৎকার করতে থাকে- '(সভয়ার্তস্বরম্) পলায়তাম্ পলায়তাম্ আয়ান্তি তে পলায়তাম্।'[145]

শৃঙ্গাররস- প্রায় সমস্ত নাট্যতাত্ত্বিকেরা রসসমূহের পরিগণনাবসরে প্রথমেই শৃঙ্গার রসের উল্লেখ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে- পৃথিবীতে যা কিছু শুভ্র, পবিত্র ও সুদর্শন তা শৃঙ্গারের সঙ্গে উপমিত হয়- 'যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যং দর্শনীয়ং বা তাবচ্ছৃঙ্গারেণোপমীয়তে।'[146] দর্পণকারের মতে শৃঙ্গ শব্দের অর্থ কামের আবির্ভাব। কামাবির্ভাবের হেতুরূপ যে রস প্রায়শই উত্তম প্রকৃতিস্থ হয়ে থাকে, তাকেই শৃঙ্গার রস বলা হয়-

"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।

উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে।।"[147]

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে এই রস দ্বিধা বিভক্ত। নায়ক নায়িকা যখন পরস্পরের প্রতি অনুরাগের আধিক্যবশতঃ পরস্পরের অবলোকন ও স্পর্শাদি উপভোগ করে, তখন আনন্দযুক্ত সম্ভোগ শৃঙ্গার হয়। অন্যদিকে পরস্পরাসক্ত প্রাণীযুগলের প্রবল রতি যখন পারতন্ত্র্যাদি কারণবশতঃ অভীষ্টকে পায় না, সেই শৃঙ্গারের নাম বিপ্রলম্ভ। শৃঙ্গার রসের স্থায়িভাব রতি। উত্তম প্রকৃতির যুবক-যুবতী এই রসের আলম্বন বিভাব। বসন্তাদি ঋতু, কাব্যাদিশ্রবন , মাল্য , চন্দন, তাম্বুল, সুরম্য পরিবেশ, স্মিতহাস্য, মনোরম অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি শৃঙ্গারের উদ্দীপন বিভাব। মধুর বাক্য, রোমাঞ্চ, কটাক্ষ, আলিঙ্গন ইত্যাদি হল সম্ভোগ শৃঙ্গারের অনুভাব এবং অশ্রুপাত, দীর্ঘশ্বাস, কৃশতা প্রভৃতি হল বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অনুভাব। সম্ভোগের ব্যভিচারিভাব হল- লজ্জা, শঙ্কা,

---

[145] *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ৮৬

[146] না. শা., সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪০

[147] সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৩০

ঔৎসুক্য প্রভৃতি। আর নির্বেদ, গ্লানি, চিন্তা, জড়তা, মরণাদি হল বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের ব্যভিচারিভাবসমূহ। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকের পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পাকিস্তানী সৈনিকরা একে অপরের কাছে নিজেদের পরিবারের প্রিয়জনেদের কথা স্মরণ করে বিলাপ করেছেন। এক সৈনিক তার পত্নীকে স্মরণ করে বলেন –

"রমণী প্রমদা কান্তা সুন্দরী সুদতী তদা।

প্রেষয়ন্তী তু যুদ্ধার্থং কেবলমশ্রু...।।"[148]

এই অংশটুকু বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের দৃষ্টান্ত। এছাড়াও আলোচ্য নাটকটিতে শান্ত, অদ্ভুত, রৌদ্র, বাৎসল্য প্রভৃতি অঙ্গরসও বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় অনুভূত হয়।

- **অলংকারের প্রয়োগ**

কাব্যালোচনায় অলংকারের গুরুত্ব সর্বাতিশায়ী। এই গুরুত্বের বিচারেই সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র কে অলঙ্কারশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণভাবে আমরা অলঙ্কার বলতে আভরণকে বুঝি, যা দিয়ে মানবদেহ সজ্জিত হয়। সাধারণ মানুষের মত কবিও কাব্যিক সৌন্দর্যের মাধ্যমেই পাঠকগণকে আনন্দ দিয়ে থাকেন। আর তাই কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ অনিবার্য। এ প্রসঙ্গে আলংকারিক ভামহের মতটি অবশ্য উল্লেখার্হ –

'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্।'[149]

---

148 *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ৯০

149 কাব্যা., পৃ. ৫

আলংকারিক বামনাচার্য সামগ্রিকভাবে অলঙ্কার শব্দের অর্থ করেছেন সৌন্দর্য। আর এই সৌন্দর্যের জন্যই কাব্য সহৃদয়ের কাছে উপাদেয় হয়। অলঙ্কারের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়েছে আচার্য দণ্ডীর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটির মাধ্যমে –

'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে।'

অর্থাৎ কাব্যের শোভা বর্ধনকারী ধর্ম-ই হল অলঙ্কার। অলঙ্কার শব্দটির অর্থ আমরা দুভাবে গ্রহণ করতে পারি। করণবাচ্যনিষ্পন্ন অলংকার শব্দটি উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি পারিভাষিক অলঙ্কার সমূহকে বোঝায়। আর ভাববাচ্যনিষ্পন্ন অলংকার শব্দের দ্বারা সাধারণ ভাবে যেকোনো সৌন্দর্য অর্থাৎ গুন, রীতি, রস প্রভৃতি কে বোঝায়।

অলংকারের শ্রেণীকরণ-

কাব্যশরীর শব্দ ও অর্থের সহযোগেই তৈরি হয়। অলঙ্কারও তাই শব্দ ও অর্থ উভয়েরই উৎকর্ষ বিধায়ক। সুপ্রাচীনকাল থেকেই আলঙ্কারিকেরা শব্দ ও অর্থ ভেদে দুই প্রকার অলঙ্কারের কথা বলেছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে অলঙ্কারের বিভাগ না থাকলেও পরবর্তীকালে ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট প্রভৃতি সমস্ত আলঙ্কারিকই অলঙ্কারের এই দুই প্রকার ভেদই স্বীকার করেছেন। আরো পরবর্তীকালে আলঙ্কারিকেরা শব্দার্থালঙ্কার বা উভয়ালঙ্কর নামে অপর একটি বিভাগ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই যে অলংকার শব্দকে আশ্রয় করে থাকে সে হল শব্দাশ্রিত। অতএব তার নাম হবে শব্দালঙ্কার। আর যে অলংকার অর্থাশ্রিত বা অর্থকে আশ্রয় করে থাকে, তার নাম অর্থালঙ্কার। কবি রামকৃষ্ণ শর্মা তাঁর '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকে শব্দ ও অর্থ উভয় প্রকার অলংকারেরই প্রয়োগ করেছেন। ক্রমে তা আলোচিত হচ্ছে-

অনুপ্রাস-

একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্তভাবেই হোক বা বিযুক্তভাবে, একাধিক বার ধ্বনিত হলে অনুপ্রাস হয়। এখানে বর্ণ বলতে ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ নয়। যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের অনুপ্রাস হয়, তাদের সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনির মধ্যে বৈষম্য থাকলেও অনুপ্রাস অক্ষুন্ন থাকে। দর্পণকারের মতে-

'অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।'[150]

লক্ষণস্থিত শব্দসাম্য কথাটির অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিসাম্য। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকের নান্দী শ্লোকে বৃত্ত্যনুপ্রাসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় –

"দোষাড়ম্বরঘোরঘনঘটাদুর্দিনায়িত জগৎসু যা।

উদেতি দেবায়িতুং লোকান্ জয়তু সা সুবর্ণাভাদেবতা।।

ভূতং ভাব্যং ভবিষ্যচ্চ প্রত্যক্ষামিব ভাসতে।

যস্যাঃ সাযুজ্যতঃ প্রাজ্ঞং সা জয়েৎকাপি দেবতা।।"[151]

এই শ্লোকটির প্রথম পংক্তিতে 'ঘ' এই ব্যঞ্জনধ্বনিটি অনুপ্রাসিত হয়েছে তিনবার এবং তৃতীয় পঙক্তিতে 'ভ' অনুপ্রাসিত হয়েছে চারবার। এছাড়াও তৃতীয় পংক্তিতে "ভব্যং ভবিষ্যচ্চ" এই অংশে 'ভ' এবং 'ব' ধ্বনি স্বরূপগত ও ক্রমগত পারম্পর্য্য বজায় রেখে দুবার আবৃত্ত হয়েছে। অতএব এখানে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

যে অলংকার একান্তভাবেই অর্থের উপর নির্ভরশীল, তাই হল অর্থালঙ্কার।

---

[150] সা. দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬

[151] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ২

উপমা-

অর্থালঙ্কারগুলির মধ্যে উপমার প্রাধান্যের জন্যই প্রথমেই আসি উপমার আলোচনায়। উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ হল তুলনা বা সাদৃশ্য। এই কারণেই তুলনা বা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যত অলঙ্কারের সৃষ্টি তাদের সকলেরই সাধারণ নাম ‘উপমা’। সাহিত্যদর্পণকার উপমা অলংকারের লক্ষণ নির্ণয়াবসরে বলেছেন -

‘সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ।’[152]

একই বাক্যে বিজাতীয় দুটি পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্মের উল্লেখ না করে যদি শুধুমাত্র গুণ বা ক্রিয়ার মাধ্যমে পদার্থদুটির সাম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাহলে উপমা অলংকার হয়। উপমার মধ্যে সাধারণত চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে- ১.সাধারণ ধর্ম, ২. ঔপম্যবাচী শব্দ(ইব, বৎ ইত্যাদি), ৩. উপমেয় (যাকে তুলনা করা হয়), ৪. উপমান (যার সঙ্গে তুলনা করা হয়)। পূর্ণোপমা ও লুপ্তোপমা ভেদে উপমা সাধারণতঃ দ্বিবিধ। ‘*বাংলাদেশোদয়ম্*’ নাটকে উপমা অলংকারের কতিপয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় –

“পুরুষস্য কৃতে নারী প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা।

তস্যাস্তু সঙ্গতির্নূনমুপযোগিতামাধুনা।।”[153]

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সমান নারীর সাহচর্য্য পুরুষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এই শ্লোকে নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

---

[152] সা. দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫২

[153] *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ২

এছাড়াও, 'সাম্প্রতং ভাষণানাং তু বর্ষর্তুতদীনামিব প্রবলবেগো বর্ততে।'[154] - এই অংশে ভাষণ হল উপমেয়, নদী হল উপমান, বেগ হল সাধারণ ধর্ম এবং ইব হল ঔপম্যবাচী শব্দ। উপমা অলংকারের চারটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকায় এখানে পূর্ণোপমা হয়েছে।

স্বভাবোক্তি অলংকার-

বস্তুর স্বভাবের যথাযথ অথচ সূক্ষ্ম এবং চমৎকার বর্ণনার নাম স্বভাবোক্তি। যদি শুধুমাত্র বাস্তবিক বর্ণনাই হত তবে তা অলঙ্কারের মর্যাদা পেত না। কবি তাঁর প্রতিভাবলে কোন বস্তুর লক্ষণটিকে এমনভাবে প্রকাশ করতে পারেন যাতে তা অন্যবস্তু থেকে পৃথক হয়ে স্বকীয় সৌন্দর্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। তবেই তা হয়ে ওঠে স্বভাবোক্তি অলংকার। আলংকারিক রুয্যক বললেন-

'সূক্ষ্মবস্তুস্বভাবস্য যথাবদ্বর্ননং স্বভাবোক্তিঃ।'[155]

'*বাংলাদোশোদয়ম্*' নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে মুজিবুরের উক্তিতে স্বভাবোক্তি অলংকারের মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়-

"বুভুক্ষিতৈর্ধর্মকথা ন ভুজ্যতে।
ন শোষিতৈভারত এব পীয়তে।।"[156]

154 *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ১৬
155 *অলঙ্কারসর্বস্বম্*, পৃ. ২০২
156 *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ২৮

ধর্মের কথা দিয়ে পেটের জ্বালা মেটানো যায় না, শোষিত জনগন ভারতকে পান করতে পারবে না- এই বাক্যের মধ্যে, দিয়ে পূর্ববঙ্গের অয়হায় মানুষের দুর্দশার সূক্ষ্ম ও চমৎকার বর্ণনা করেছেন কবি।

উৎপ্রেক্ষা অলংকার –

'ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা'[157]

প্রকৃতকে প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ যদি পরাত্মা বলে উৎকট সংশয় হয়, তাহলে হয় উৎপ্রেক্ষা। প্রকৃত= উপমেয় বা বিষয়, পরাত্মনা= উপমান বা বিষয়ী। উপমার মত উৎপ্রেক্ষাও সাদৃশ্যঘটিত অলঙ্কার। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্যের জন্যই উপমেকে উপমান বলে জ্ঞান হয়। উৎপ্রেক্ষার দুটি স্থান- বাচ্য ও প্রতীয়মান। ইবাদি শব্দের উল্লেখ থাকলে হয় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। এবং ইবাদি শব্দের অনুপস্থিতিতে হয় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। এখন প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক যে উপমা অলঙ্কারেও তো ইবাদি শব্দের উল্লেখ থাকে, তবে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার পার্থক্য কোথায়? উত্তরে বলা যায়, উপমায় ইব প্রভৃতি শব্দ হল ঔপম্যবাচী আর উৎপ্রেক্ষায় তা হল সম্ভাবনাবাচী। উপমান বস্তুটি যদি বাস্তবসম্মত হয় তবে সেখানে ইবাদি শব্দ হবে ঔপম্যবাচী। আর যদি উপমান বস্তুটির বাস্তব সত্ত্বা না থাকে তবে সেখানে ইব প্রভৃতি শব্দ হবে সম্ভাবনাবাচী।

---

[157] সা. দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১২২

'*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকের 'যৎ সর্বস্মিন্ পাকদেশে ভারতবৈনানিকা শ্যেনাঃ কপোতানিব, সিংহাঃ মহিষানিব, গরুড়াঃ ভ‌ুজঙ্গানিব, অন্বেষমন্বেষং প্রতিপাকসৈন্যম্-সৈন্যসংস্থানঞ্চ, আক্রমন্তে।'[158]

অতিশয়োক্তি-

উপমার চরম পরিণতি হয় অতিশয়োক্তিতে। সম্ভাবনাত্মক অধ্যাবসায় সিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক হলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। বিষয়ের (উপমেয়ের) সঙ্গে বিষয়ীর (উপমানের) অর্থাৎ যথার্থ বস্তুর সঙ্গে অযথার্থ বস্তুর কবি প্রসিদ্ধিবশতঃ নিশ্চয়তা সিদ্ধ হলে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। এক কথায় যখন উপমেয়ের উপমানরূপে নিশ্চয় হয়, তখন তাকে বলে অতিশয়োক্তি। অতিশয়োক্তির সাহিত্যদর্পণবিধৃত লক্ষণটি হল-

'সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।'[159]

লক্ষণস্থিত অধ্যবসায় শব্দটির অর্থ হলো অযথার্থ বস্তুর (উপমান) দ্বারা যথার্থ বস্তুর (উপমেয়ের) গ্রাস বা নিগরণ। 'বাংলাদেশোদয়ম্' নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে ডি.পি. ধরের মুখে ইয়াহিয়া খানের পরিস্থিতি বর্ণনায় অতিশয়োক্তি অলংকার লক্ষিত হয় –

''ভুট্টো যস্য শিরস্তথা হি চরণৌ দৃপ্তাঃ মহাসৈনিকাঃ।

একো বাহুরমেরিকাথ হ্যপরশ্চীনো মহাকৈতবী।।''

রাজ্যং যদ্বিবিধং তদেব চ তনুঃ প্রাচী প্রতীচ্যোঃ স্থিতম্।

[158] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ১৮৪

[159] সা. দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৩

হংহো ধন্যতয়া বিচিত্রবিভবা যাহাস্য যাহ্যাকৃতি।।”[160]

অর্থাৎ ভুট্টো যার মস্তকস্বরূপ, সৈনিকেরা যার পাদস্বরূপ, যার এক হাত আমেরিকায় এবং অপর হাত চীনে। তার শরীরের এক অংশ পশ্চিমে এবং অপর অংশ পূর্বে বিভক্ত হয়ে আছে।

বিশেষোক্তি অলংকার-

প্রসিদ্ধ কারণ ধাকা সত্ত্বেও যদি অভিপ্রেত ফলের অনুৎপত্তি বর্ণিত হয়, তাহলেই বিশেষোক্তি হয়। কারণ থাকা সত্ত্বেও ফলাভাব কিভাবে সম্ভব? এ বিষয়ে আলঙ্কারিক জগন্নাথের উত্তর হল- কারণ থাকলে কার্যোৎপত্তি হবেই। যদি তা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সেই কারণের অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিশেষোক্তির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। প্রতিবন্ধকতা থাকায় প্রসিদ্ধ কারণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও ফলোৎপত্তি হয় না। বিশেষোক্তির সাহিত্যদর্পণোক্ত লক্ষণটি হল-

‘সতি হেতৌ ফলাভাবঃ বিশেষোক্তিস্তথা দ্বিধা।’[161]

লক্ষণ থেকেই স্পষ্ট হয় যে এই অলঙ্কার দ্বিবিধ। যথা উক্তনিমিত্ত এবং অনুক্তনিমিত্ত। যেখানে ফলোৎপত্তির প্রতিবন্ধক বিষয়টির উল্লেখ থাকে, সেক্ষেত্রে উক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি হয়। আর যেক্ষেত্রে ফলোৎপত্তির প্রতিবন্ধক বিষয়টি অনুল্লিখিত থাকে সেখানে হয় অনুক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি। ‘*বাংলাদেশোদয়ম্*’ নাটকের পঞ্চমাঙ্কে-

“অলহা নাম সমুচ্চয়ার্থ ভাবাবেশে ন যে গতাঃ।

---

160 *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ১০৮

161 সা. দ., সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২২৭

মন্বতে নৈব চাস্মান্ যে তে সর্বে কাফিরা মতাঃ।।"[162]

এখানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সত্ত্বেও ভাবাবেগ আপ্লুত হয়নি। আল্লাহর নামোচ্চারণের প্রতি প্রশিদ্ধ কারণ হল ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়া উচিত। কিন্তু কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ফলোৎপত্তি ঘটেনি। আর ফলোৎপত্তি না হওয়ার প্রতিবন্ধক বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় এখানে অনুক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি হয়েছে।

রীতির স্বরূপ

সাহিত্যতত্ত্বে ব্যবহৃত রীতি শব্দটির প্রয়োগ বাক্ পদ্ধতি বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। কাব্যাদর্শ প্রণেতা দন্ডী রীতির সমর্থনে পুরোভাগে থাকলেও নবম শতাব্দীর আলঙ্কারিক বামন তাঁর '*কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ*' গ্রন্থে লিখলেন- 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য।' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল রীতি। রীতি পদের ব্যাখ্যায় তিনি বললেন - 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।' অর্থাৎ বিশিষ্ট পদসংঘটনই হল রীতি। আবার বিশেষের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন 'বিশেষো গুনাত্মা।', তাই রীতির সঙ্গে গুণের সম্পর্ক অতি নিবিড়। রীতি হচ্ছে স্টাইল। রীতিবাদের বক্তব্য হল স্টাইলের গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়ে ওঠে। আচার্য দণ্ডী রীতির পর্যায়বাচী শব্দ হিসেবে মার্গ, বর্ত্ম , পদ্ধতি - এই শব্দগুলির ব্যবহার করেছেন। এক কথায় রীতি হল লেখনশৈলী। আচার্য দণ্ডী তাঁর *কাব্যাদর্শ* গ্রন্থে বলেছেন-

'অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।'[163]

[162] *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ৯৪

[163] কা. দ., পৃ. ১০৪

অর্থাৎ বাক্ প্রয়োগের অনেক প্রকার পদ্ধতি আছে, তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যও রয়েছে। দণ্ডী বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আচার্য বামন আবার পূর্বোক্ত দুই প্রকার রীতির সঙ্গে পাঞ্চালী রীতিকেও মেনেছেন। বিদর্ভ, গৌড় ও পাঞ্চাল দেশের কবিদের রচনারীতি থেকেই এইরূপ নামকরণ-

'বিদর্ভগৌড়পাঞ্চালেষু দেশেষু তত্রত্যৈঃ কবিভির্যথাস্বরূপম্ উপলব্ধত্বাদ্দেশসমাখ্যা।'[164]

ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্যাদি গুণের উপস্থিতিতেই বাকপদ্ধতি গঠিত হয়। আচার্য দণ্ডী ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্য, উদারতা, সমতা, শ্লেষ, কান্তি, অর্থব্যক্তি ও সমাধি এই দশটি গুণ স্বীকার করেছেন-

বৈদর্ভী রীতি-

বৈদর্ভী রীতিতে ওজঃ প্রসাদাদি দশপ্রকার গুনের সমাবেশ থাকে। দোষ মাত্রের স্পর্শরহিত সকল গুনে বিভূষিত এবং বীনার স্বরের ন্যায় শ্রুতিনন্দন রীতিকেই বৈদর্ভী রীতি বলা হয়। এই রীতির ব্যবহার শৃঙ্গার, করুণ এবং শান্ত রসে হয়ে থাকে। সমস্ত প্রকার গুণের সমাবেশ থাকায় এই রীতিই উপাদেয়।

গৌড়ী রীতি-

ওজোগুণব্যঞ্জক, দীর্ঘসমাসবদ্ধ রচনাকে গৌড়ী রীতি বলে। আচার্য বিশ্বনাথের মতে-

"ওজঃ প্রকাশকৈর্বর্ণৈর্বন্ধ আড়ম্বর পুনঃ।

সমাসবহুলা গৌড়ী।।"[165]

---

164 কা. সূ. বৃ., পৃ. ১৭

165 সা. দ., সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৬৮৬

ওজোগুনপ্রকাশক বর্ণের দ্বারা আড়ম্বরপূর্ণ, সমাসবহুল রচনাকে গৌড়ী রীতি বলে। ওজঃ এবং কান্তি নামক গুন এই রীতিতে বিদ্যমান থাকে। রৌদ্র ও ভয়ানক রসের বর্ণনায় এই রীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

"বন্দরগাহঃ করাচ্যাস্ত হন্েহা দন্দহ্যতেঽধুনা।

তদগ্নিদাহদগ্ধা কিং যাহ্যাজিহ্বাপি হ্যুষ্ণিতা।।"[166]

এই শ্লোকে ভয়ঙ্কর রসের উপস্থিতিতে গৌড়ী রীতি পাওয়া যায়।

পাঞ্চালী রীতি-

'মাধুর্যসৌকুমার্যপোপন্না পাঞ্চালী।'[167]

মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণের উপস্থিতিতে পাঞ্চালী রীতি হয়। অল্পসমাসযুক্ত সুকুমারপদে ভূষিত রীতিই হল পাঞ্চালী। 'বাংলাদেশোদয়ম্' নাটকে 'অহো আল্লা ! অরে বঙ্গাঃ যদি যূয়ং স্থ ভূতলে।'[168] – এই অংশটি পাঞ্চালী রীতির ক্ষেত্র।

গুণসমীক্ষা

শব্দ এবং অর্থ এই উভয় উপাদানেই কাব্য শরীর গঠিত হয়। কিন্তু লৌকিক জগতে ব্যবহৃত শব্দ এবং অর্থের সঙ্গে কাব্যে প্রযুক্ত শব্দ ও অর্থের বিস্তর পার্থক্য আছে। সাহিত্য সমালোচকেরা বলেন কাব্যে প্রযুজ্য শব্দ ও অর্থকে লৌকিক জগতের তুলনায় অধিকতর চমৎকারী হতে হবে। আর এই চমৎকৃতির মূল নিয়েই আচার্যগণের মধ্যে

---

166 *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ১৫২

167 কা. সূ. বৃ., পৃ. ২১

168 *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ৮৬

মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং এক একটি প্রস্থানের সৃষ্টি হয়। ভরত, ভামহ, দণ্ডী, বামন, আনন্দবর্ধন, কুন্তক প্রত্যেকেই তাঁদের নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাব্যের তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আচার্য ভরতের মতবাদ রসপ্রস্থান নামে পরিচিত। এইরূপ যথাক্রমে ভামহ অলঙ্কার প্রস্থানের, দণ্ডী গুণপ্রস্থানের, বামন রীতিপ্রস্থানের, আনন্দবর্ধন ধ্বনিপ্রস্থানের এবং কুন্তক বক্রোক্তিপ্রস্থানের জনক রূপে খ্যাত। আচার্য বামন তাঁর '*কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ*' গ্রন্থে গুণের আলোচনাবসরে বলেছেন-

'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মাঃ গুণাঃ।'[169]

বামনের মতে কাব্যের আত্মা হল রীতি এবং রীতির আত্মা গুণ। তাই গুণ কাব্যের নিত্য ধর্ম। গুণ ব্যতিরেকে কাব্য হতে পারে না। আচার্য দন্ডী ওজঃ , প্রসাদ, শ্লেষ, সমাধি, সমতা, মাধুর্য, সৌকুমার্য, উদারতা, অর্থব্যক্তি ও কান্তি এই দশটি গুণ স্বীকার করেছেন। দণ্ডী তাঁর গ্রন্থে এই দশটি গুণ এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আচার্য ভামহ আবার ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য এই তিনটি গুণ স্বীকার করেন। এর মধ্যে ওজঃ ও মাধুর্য হল শব্দগুণ এবং প্রসাদ হল অর্থগুণ। শ্রবণমাত্রেই অর্থের প্রতীতি যেখানে হয় এবং যা শ্রুতিনন্দন ও শীঘ্রই সহৃদয়ের চিত্তকে বিগলিত করে তা প্রসাদ গুণ। আচার্য ভামহ প্রসাদ গুণের লক্ষণ নিরূপণাবসরে বলেছেন-

"শ্রব্যং নাতিসমস্তার্থ্যং কাব্যং মধুরমিষ্যতে।

অবিদ্বদঙ্গনাবালপ্রসিদ্ধার্থং প্রসাদবৎ।।"[170]

---

[169] কা. সূ. বৃ., পৃ. ৬৯

[170] কাব্যা., পৃ. ২২

আলোচ্য নাটকে ওজঃ, মাধুর্য, প্রসাদ এই তিন গুণেরই সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। দশমাঙ্কে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য সত্যিই প্রসাদগুণগুম্ফিত-

"বঙ্গভারতলোকানাং রক্তেন সিঞ্চিতা ত্বিয়ম্।

স্বতন্ত্রতা হি বঙ্গস্য জীবতাজ্জয়তাৎ সদা।।"[171]

শ্লোকটির পাঠেই এর অর্থ বোধগম্য হয়। সমাসের অভাব থাকায় এবং অল্পাক্ষরযুক্ত হওয়ায় শ্লোকটি শ্রুতিসুখকর।

ছন্দোবিচার

বেদ ব্যাখ্যাতা আচার্য সায়নের মতে ছন্দ শব্দটি আবরণার্থক ছদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। আবার বেদের প্রাচীন নামও ছন্দ। অতিগহন বেদমন্ত্রের অর্থাবগমনের জন্য শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে ছন্দ পঞ্চম বেদাঙ্গ হিসেবে প্রখ্যাত। *পাণিনীয়শিক্ষা* গ্রন্থে ছন্দকে বেদের চরণ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে - 'ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য।' চরণদ্বয় ব্যতিরেকে গমন ক্রিয়া যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনই ছন্দের জ্ঞান অপেক্ষা বেদাধ্যয়ন ও অর্থবোধ সম্ভবপর নয়।

বেদ পরবর্তী ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষাতেও ছন্দের অপরিহার্যতা লক্ষণীয়। লৌকিক সংস্কৃতে যথাক্রমে অনুষ্টুপ্-ইন্দ্রবজ্রা- উপজাতি- মালিনী- বসন্ততিলক- মন্দ্রাকান্তা- স্রগ্ধরা-বংশস্থবিল ইত্যাদি অসংখ্য ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অর্বাচীন সংস্কৃত কবিরা ছন্দের প্রয়োগেও নবীনত্ব এনেছেন।

---

[171] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ২০৮

আলোচ্য নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুষ্টুপ্ ছন্দের ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। এছাড়া মাত্র দু-একটি স্থানে ভুজঙ্গপ্রয়াতম্, ইন্দ্রবংশা ও উপজাতি ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। আচার্য ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন-

"কাব্যে রসানুগুনেন বর্ণনানুগুনেন চ।

কুর্বীত সর্ববৃত্তানাং বিনিয়োগং বিভাগবৎ।।"[172]

অর্থাৎ রস ও বর্ণের অনুকূল ভাবেই কাব্যে বা নাটকে ছন্দের প্রয়োগ হওয়া উচিত। অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণ নির্ণয়াবসরে ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাস বলেছেন-

"পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।

গুরু ষষ্ঠঞ্চ পাদানাং শেষেষ্বনিয়মো যথা।।"[173]

সমস্ত পাদেই পঞ্চমবর্ণ লঘু এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সপ্তমবর্ণ লঘু। তথা সমস্ত পাদেরই ষষ্ঠবর্ণ গুরু, এর প্রতিপাদে অপরাপর বর্ণসম্বন্ধে কোন নিয়ম নেই। মহাকবি কালিদাসের নামে প্রচলিত *শ্রুতবোধ* নামক গ্রন্থে বিধৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণটি হল-

"শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।

দ্বিচতুর্থয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ।।"[174]

'*বাংলাদেশোদয়ম্* নাটকের অষ্টম অংকের একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হলো-

"চেন্নো বয়ং হঠং ত্যক্ত্বা কুর্ম আত্মসমর্পণম্।

---

172 *সুবৃত্ততিলকম্*, পৃ. ১০৯

173 *ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ১৮১

174 *শ্রুতবোধ*, পৃ. ৫

অস্থিমাংসাদয়োঽস্মাকং ছিন্নাঃ ভিন্নাঃ ভবন্তি বৈ।।”[175]

এছাড়াও নাটকটির ভরতবাক্যটিও অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত। উদাহরণ হিসেবে শ্লোকটি উল্লেখ করা হল-

“গঙ্গা চ যমুনা যাবদ্ বঙ্গসিন্ধুহিমালয়ৌ।

বঙ্গভারতয়োর্মৈত্রী তাবৎ স্থাস্যতি ভূতলে।।”[176]

রচনাশৈলী

‘কাব্যং তু জায়তে জাতু কস্যচিত্ প্রতিভাবতঃ।’[177]

ভামহোক্ত এই বাক্যটিতে প্রাঞ্জল ভাবে বলা হল যে, প্রতিভাই কাব্য নির্মাণের হেতু। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কি এই প্রতিভা? ‘প্রতিনিয়তং ভাতি প্রকাশয়তি ইতি প্রতিভা’ - এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘প্রতি-ভা’ ধাতুর সঙ্গে ‘ক’ প্রত্যয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ‘টাপ্ প্রত্যয় করে ‘প্রতিভা’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। প্রতিনিয়ত যার রচনায় নবীনত্বের আভাস পাওয়া যায়, তাকেই প্রতিভা বলে, এ প্রসঙ্গে আলংকারিক ভট্টতৌতের মতটি না উল্লেখ করলেই নয়-

‘প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।’

লৌকিক জগতের সাধারণ মানুষ এই প্রতিভার অধিকারী হন না। প্রতিভা কেবলমাত্র কবিগত। মূলতঃ তাঁরাই কবি যাঁদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি আছে। কবিরা হলেন ক্রান্তদর্শী। অগ্নিপুরাণে আছে-

[175] *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ১৪৮

[176] তত্রৈব, পৃ, ১৪৮

[177] কাব্যা., পৃ. ২

“নরত্বং দুর্লভং লোকে

বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।

কবিত্বং দুর্লভং তত্র

শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।।”

“এ জগতে মনুষ্যজন্ম লাভ দুর্লভ। মনুষ্যজন্ম লাভ করলেও বিদ্যালাভ সুদুর্লভ। বিদ্যালাভ করলেও কবিত্বলাভ আরও দুর্লভ, আর তার থেকেও দুর্লভ ‘প্রতিভা’-র অধিকারী হওয়া।”[178]

এ কথা সত্য যে প্রতিভা না থাকলে রমণীয় কাব্য রচনা সম্ভবপর নয়। প্রতিভা নীরস বস্তুকে সরসতা দান করে। কবির প্রতিভা নির্ভর করে তাঁর মৌলিক চিন্তনের উপর। যার ফলে তিনি এক অলৌকিক মায়ার জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন। যে জগতে তিনিই একমাত্র প্রজাপতি স্বরূপ। তাই পৃথিবী যেভাবে তার কাছে ধরা দেয় তিনি তা অনায়াসে স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

‘*বাংলাদেশোদয়ম্*’ এর কবি রামকৃষ্ণ শর্মা নিঃসন্দেহে এই অতি দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী। স্বীয় প্রতিভাবলেই তিনি সাম্প্রতিক বিশ্বের একটি রাষ্ট্রের উদয়ের ইতিহাসকে অপূর্ব নাট্যরূপ দিয়েছেন। ইতিহাসের নীরসতাকে কাটিয়ে সহৃদয়ের চিত্তকে অনায়াসে রসসিক্ত করেছে তার লেখনী। নাটকের প্রায়োগিক তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ। নান্দী, প্রস্তাবনা, বিষ্কম্ভক, প্রবেশকাদি অর্থোপক্ষেপক, ভরতবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ দেখে বোঝা যায় যে তিনি প্রথাগত ঐতিহ্যকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। ঐতিহ্যানুসরণের পাশাপাশি কবি তাঁর রচনায় কিছু সময়োপযোগী অভিনবত্বও এনেছেন।

---

[178] চট্টোপাধ্যায়, ঋতা., শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ, পৃ. ৯৮

কবিসৃষ্ট অভিনবত্ব

বিষয়বস্তুগত-

নাটক নামেই তার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ আভাস পায়। বাংলাদেশ নামক এক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদয়কে আশ্রয় করে কবি দশমাঙ্ক বিশিষ্ট নাটকটি রচনা করেন। রচনার বিষয়ের জন্য কবি তাঁর পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে সাম্প্রতিক ইতিহাসকে বেছে নিয়েছেন। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭২, আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল ১৯৭১। যুদ্ধের সময় ও রচনার সময়ের ব্যবধান যেহেতু খুব অল্প সময়ের তাই যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী সময় লৌকিক জীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছে তা নাটকটির পাঠে অনায়াসে বোধগম্য হয়। স্বাধীনতার প্রভাব কবির রচনাশৈলীতে পড়েছে। কবি তাঁর রচনার জন্য এই যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তৎকালীন সংবাদপত্র ও যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া তার কলমে ধরা দিয়েছে। যার ফলে তাঁর এই সৃষ্টি এক অন্যতম ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রয়ে গেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসীম সাহসিকতার প্রাঞ্জল বর্ণনায় নাটকটি পুষ্ট হয়েছে। নাট্যকার তাঁর রচনা মাধ্যমে বীর সৈনিকদের অর্ঘ্য প্রদান করেছেন-

"অহিংসা লোকস্বাতন্ত্র্যন্যায়সৌখ্যাদিকারণম্।

ভারতস্যোৎকটং শৌর্যং পুনরুজ্জীবিতন্তু যৈঃ।।

ভয়ার্তপ্রাণরক্ষণং স্বপ্রাণৈঃ খেলিতন্তথা

তেভ্যস্সৈনিকবীরেভ্যঃ কৃতিরেষা সমর্পিতা।।"[179]

নাটকের পূর্বে নিবেদনাংশে কবি বলেছেন, বাংলাদেশের উদয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনার পূর্ব ইতিহাস, বিভিন্ন অঙ্গ উপাঙ্গ, দলিলপত্র এবং সামাজিক প্রতিফলন সম্পর্কে কবির আন্তরজিজ্ঞাসার ফলস্বরূপ এই রচনা। বিষয়বস্তুর সমসাময়িকতাকে মাথায় রেখে কবি কল্পনাবিলাস থেকে বেরিয়ে এসে ইতিহাস রক্ষায় তৎপর হয়েছেন। ভারতীয় বীরেদের অদম্য সাহস, তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির সাফল্য এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উল্লেখে কবির লেখনী স্বতন্ত্র্য। যুদ্ধে উভয়পক্ষীয় সৈনিকদের মনস্থিতি, ভয়ার্ত জনগণের আর্তনাদ যেমন নাটকে বর্ণিত হয়েছে তেমনই ধৈর্য, করুণা এবং লোকোপকারও চিত্রিত হয়েছে অসামান্য দক্ষতায়।

ভাষাগত-

ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবি সংস্কৃত নাটকের প্রচলিত নিয়ম ভেঙেছেন। নাটকে উপস্থাপিত স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত চরিত্রই সংস্কৃতভাষী। এছাড়াও নাট্যকার পাক- চরিত্রদের উপযোগী উর্দু ও ফার্সী শব্দেরও ব্যবহার করেছেন-

"অ...অ...অ...মেরে

অ....অ....অ....মেরে হমবতন দোস্তো সালাম।"[180]

এর পাশাপাশি কবি রামকৃষ্ণ শর্মা উর্দু এবং ইংরেজি শব্দকে সংস্কৃতের সঙ্গে যুক্ত করে

পাক চরিত্রদের মুখে বসিয়েছেন –

---

[179] *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ৪

[180] তত্রৈব, পৃ. ১৯২

‘পান, বীড়ি, চায়পানঞ্চ কুর্বন্তি।’[181] ‘অন্সরসো গতাঃ ক্লবমুখম্।’[182]

আবার কখনো উর্দু ও ইংরেজি শব্দগুলিকে অপরিবর্তিনীয় ভাবেই প্রয়োগ করেছেন-

‘সদরে রিয়াসত….ফীণ্ডমার্শল মুকর্রমী যাহ্যাখান।’[183]

কখনও কখনও নাট্যকার উর্দু শব্দগুলিকে এমনভাবে সংস্কৃতায়িত করেছেন যে আপাতদৃষ্টিতে তাদের ভিন্নতা বোঝা সম্ভব হয় না-

সংস্কৃত	**উর্দু**
খর-স্বভাবাঃ	খর-দিমাগ
বিশমনিঃ	বশরম
দোষজ	দোজখ
সুরাধি	সুরাহী

আবার কখনও উর্দু শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগে সংস্কৃত রূপ দিয়েছেন। যেমন – অফসরান্, সাইরনানাম্, ট্রান্সিষ্টর, চৌক্যঃ প্রভৃতি। পাক চরিত্রদের পাশাপাশি বাঙালী চরিত্রদের আবেগকে প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষার ব্যবহারও করেছেন। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর অকথ্য অত্যাচারে নিপীড়িত অসহায় বাঙ্গালীদের আর্তনাদকে ব্যক্ত করার জন্য বাংলা ভাষার ব্যবহার কবির অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয়ক -

‘বৃদ্ধাঃ - এই শিশুদের প্রতি দয়া কোরো দয়া কোরো

---

181 *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ১২০

182 তদেব

183 *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ১৩৯

অন্যশব্দঃ - এরা তোমাদের কী খোতী করেছে।

তরূণীশব্দঃ - অরে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার শোরীর ভালো নাই।'[184]

চরিত্রগত-

নাটকের নায়ক নির্বাচনেও নাট্যকার অভিনব চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য নাটকটির নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী তিনি না কোন রাজর্ষি, আর না কোন প্রখ্যাত বংশজাত ব্যক্তি। তিনি একজন সাধারণ জননেতা, একজন দেশপ্রেমিক। আর আমরা দেখেইছি যে স্বাধীনতা যুদ্ধের আবহে অনুপ্রাণিত সংস্কৃত কবিরা তাঁদের রচনায় নায়ক হিসেবে দেশপ্রেমিকদের অবলীলায় স্থান দিয়েছেন। যেমন কবি নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের অমরবীরবৃত্তান্তম্ নাটকের নায়ক হলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর ভারতলক্ষ্মীনাটকম্ নাটকের নায়িকা হলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইত্যাদি। অর্বাচীন আলঙ্কারিক অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর গ্রন্থ 'অভিরাজযশোভূষণম্' এ নাটকের লক্ষণ নির্ণয়াবসরে নায়ক নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেন-

'কশ্চিদ্ গুণবাংল্লোকনায়কঃ।'[185]

মুজিবের সাহস, বীরত্ব, শৌর্য, চারিত্রিক দার্ঢ্য প্রভৃতি দেখে বলা যায় যে তিনি প্রকৃতই নায়ক হওয়ার যোগ্য।

এবার আসি নায়িকা প্রসঙ্গে। নাটকটির নায়িকা হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এখানে নায়িকা তথাকথিত সংস্কৃত নাটকের মতো নয়। সংস্কৃত নাটকের নায়িকা বলতেই আমাদের সামনে

---

184 *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ৯৬

185 *অভিরাজযশোভূষণম্,* পৃ. ২০০

ভেসে আসে শকুন্তলা বা বাসবদত্তার নাম। রূপবতী, অন্তঃপুরচারিনী হিসেবে তাঁদের উপস্থাপনা হতো। কিন্তু স্বাধীনতোত্তর কালে এই ধারণার বদল ঘটেছে সর্বাংশে। মহীয়সী রমনীরাও কবিদের রচনায় জয়গা করে নিয়েছেন। যেমন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ। আলঙ্কারিক রাজেন্দ্র মিশ্রের মতে-

'মহিলাপি ততো নেতা স্যাদৌদাত্যমহীয়সী।'[186]

ন্যায়পরায়ণ, দৃঢ়চেতা, বিচক্ষণ, কুশলী, রাজনীতিবিদ্ হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা অসামান্য দক্ষতায় লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। বাংলাদেশের মুক্তিতে তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তা দেখে তাকে নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের কান্ডারী বলা চলে। দেশের সুষ্ঠু চালক হিসেবে শান্তির পথ বেছে নেওয়ার পাশাপাশি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা স্ফুট হয় –

"মুজিবমোচনং প্রত্যাগমনং শরণার্থিনাম্।
লোকতন্ত্রস্থিতির্বঙ্গে প্রতিজ্ঞাত্রিতয়ং মম।।"[187]

এছাড়াও, অংকগুলির দৃশ্যবিভাগ, বিষয়বস্তুর অগ্রগতির জন্য বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক অংশে কিছু গৌণ চরিত্রের উপস্থাপনা এবং তাদের কথোপকথনে অধিকাংশে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বর্ণনা, বিষ্কম্ভককে দুটি ভাগে বিভক্ত করার মাধ্যমে তিনি নাটকটিকে অভিনব করে তুলেছেন।

[186] *অভিরাজযশোভূষণম্,* পৃ. ২০০
[187] *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ২০৬

অতএব সমস্ত দিক থেকে পর্যালোচনা করে বলা যায়, নাটকটিতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন কবি

॥ উপসংহার ॥

ন স শব্দো ন তদ্ বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা।

জায়তে যন্ন কাব্যঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ।।[188]

আমাদের প্রতিদিনের চেনা জগৎ এবং অতি পরিচিত কাহিনীও কবির লেখনীর স্পর্শে কাব্যের বিষয় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য তিনটি নাটকের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলনকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার কবিরাও সেই রচনাধারা থেকে বিরত হননি। নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ, জি. বি. পলসুলে, রামকৃষ্ণ শর্মা প্রমুখ কবিরা তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এই অতি গম্ভীর বিষয়কে অপূর্ব নাট্যরূপ দিয়েছেন। ফলতঃ আমরা একদিকে ঐতিহাসিক তথ্যে ঋদ্ধ হই, অপরদিকে নাট্যরসও আস্বাদন করতে পারি। বিষয়বস্তু, নায়কনির্বাচন, রচনারীতি, ভাষাসৌষ্ঠব প্রভৃতি দিক থেকে এই কবিরা তাঁদের রচনায় সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য রচনার ধারাকে যেমন অনুসরণ করেছেন তেমন স্বকীয় ভাবনাকেও নির্দ্বিধায় সহৃদয় সমক্ষে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি সাহিত্যে সময়ের প্রতিফলন ঘটে। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজে মানুষের নিকট বিনোদনের অনেক মাধ্যম উপস্থিত হয়েছে কিন্তু প্রাচীনকালে নাটকই ছিল এক অন্যতম মাধ্যম। আজকের এই প্রতিযোগিতার যুগে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নাটককে বাঁচিয়ে

[188] *কাব্যালংকার, সম্পা. রমণকুমার শর্মা* ৪/৫

রাখতে হলে তাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতেই হবে। বিশ শতকের কবিরা সেই কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়

প্রথমতঃ, তিনটি নাটকই বিষয়বস্তুগত দিক থেকে আধুনিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী বাঘাযতীনের সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশের যুদ্ধকে আশ্রয় করে রচিত নিত্যানন্দের নাটক '*বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্*' । নাটকটি রচিত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। কিন্তু বালেশ্বরের যুদ্ধ হয়েছিল ১৯১৫ সালে। স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছর পরে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটক রচনা বিষয়টির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। ইতিহাসকে আশ্রয় করে নাটকটি রচিত হওয়ায় কবিকে অনেকাংশে কল্পনাবিলাস পরিহার করতে হয়েছে। অভিসন্দর্ভে আলোচিত অপর একটি নাটক মহারাষ্ট্রের জি. বি. পলসুলে বিরচিত '*ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্*' । এই নাটকটি দেশপ্রেমিক বিনায়ক দামোদর সাভারকারের চরিতাশ্রিত। বিপ্লবীদের জীবনী ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নামক নাটকটিও আলোচিত হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। আমরা সকলেই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত। এই যুদ্ধের পর বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। কবি রামকৃষ্ণ শর্মা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ১৯৭২-এ নাটকটি রচনা করেন। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে বিশ শতকের নাট্যকারেরা তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে পৌরাণিক বিষয়ের অপেক্ষা সমকালীন বাস্তবতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষার ব্যবহারেও কবিরা প্রচলিত নিয়মকে লঙ্ঘন করেছেন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নাটকের স্ত্রীচরিত্রদের ভাষা হবে প্রাকৃত। কিন্তু বর্তমান কবিরা তাঁদের রচনায় প্রাকৃতভাষা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নাটকের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর মুখে সংস্কৃত বসিয়েছেন। তার পাশাপাশি দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার কমেছে। নাটক রচনার উদ্দেশ্য যেহেতু সহৃদয়ের চিত্তের আনন্দবিধান তাই ভাষায় প্রসাদগুণের বাহুল্য লক্ষিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের মনোগত ভাবনাকে সুস্পষ্ট রূপ দিতে তাদের মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন কবিরা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে। বাঙালী চরিত্রের মুখে বাংলা ভাষা, মারাঠী চরিত্রের মুখে মারাঠী ভাষা ও পাকিস্তানী চরিত্রদের জন্য উর্দু ও ফার্সী ভাষারও ব্যবহার হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, গঠনগত দিক থেকেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে বিশ শতকের নাটকে। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই দৃশ্যবিভাগ লক্ষণীয় যা নাটকের মঞ্চবিধিগত এক অভিনবত্ব। এছাড়া নান্দীর অভাব, অর্থোপক্ষেপকের অভাব, নাটকগুলির অঙ্কসংখ্যা দীর্ঘায়িত না করে একাঙ্ক নাটকের রচনা ইত্যাদি আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অভিনবত্ব। যেমন পলসুলের '*ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্*' নাটকটি চার অঙ্ক বিশিষ্ট।

সর্বদা যে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন এমন নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাচীন পন্থাকেও অনুসরণ করেছেন। যেমন নাটকের অঙ্ক বিভাগ বা ভরতবাক্যের প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় এখানে উল্লেখনীয়। '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকের ভরতবাক্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতেই পারে-

"গঙ্গা চ যমুনা যাবদ্ বঙ্গসিন্ধুহিমালয়ৌ।

বঙ্গভারতয়োর্মৈত্রী তাবৎ স্থাস্যতি ভূতলে।।"[189]

এবারে আসি আধুনিক নাটকের গানের প্রসঙ্গে। ভরতের '*নাট্যশাস্ত্র*'-এ উল্লিখিত ধ্রুবা গীতি আধুনিক নাটকে বারবার ফিরে এসেছে। আমাদের আলোচ্য নাটকগুলিতেও অনবদ্য গানের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি আধুনিক নাটকে আঞ্চলিক ও পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবও পড়েছে। যেমন- '*বাংলাদেশোদয়ম্*' নাটকে লোকগীতির প্রয়োগ হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অনেক নাটকে বাদ্যধ্বনি, যুদ্ধধ্বনি, করুণসঙ্গীত, সুখসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে 'বাংলাদেশোদয়ম্' নাটকে নর্তকীদের গানের উল্লেখ করা যেতে পারে –

"মা...নিপীড় মাঽঽবরোহ,

মা...মথান মেঙ্গকম্।

মাঽস্মদীয় উরসি জনয়,

মধুর-মধুর পীড়ণম্।

কামকেতুমানয়ন্,

খেল কেলি মন্দিরে।

[189] *বাংলাদেশোদয়ম্*, পৃ. ২০৮

রোমরাজিমঞ্জুয়-

ননঙ্গ রঙ্গ সুন্দরে।

অয়ি অলম্ অয়ি অলম্,

...অভিনবং যৌবনম্।

অভিনবং যৌবনম্।।”[190]

ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিসর

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের পরিসর সুবিস্তৃত। এই অভিসন্দর্ভে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী মাত্র তিনটি সংস্কৃত নাটকের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটকের সুদীর্ঘ তালিকা সত্যিই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। অভিলাষী ব্যক্তিরা এই বিষয়ে গবেষণায় অগ্রসর হতে পারে। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নাটকই নয়, এখানে নির্বাচিত তিনজন কবির অন্যান্য আরও অনেক কাব্য রয়েছে যেগুলি গবেষণার বিষয় হতে পারে।

১. অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য ও সংস্কৃত ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্যের আলোচনাবসরে কিছু নাটকের তালিকা ব্যবহার করা হয়েছে। এই তালিকায় উল্লিখিত বেশ কিছু নাটকে অবলম্বন করে অদ্যাবধি কোনরকম গবেষণা হয়নি। নাটকগুলি বিষয়বস্তুগতভাবে আধুনিক। কিছু নাটক প্রচলিত বিষয়ের আধারে

[190] *বাংলাদেশোদয়ম্,* পৃ. ৩৪

রচিত হলেও অন্যান্য বিষয়ে অভিনবত্ব এনেছেন নাট্যকারেরা। এই নাটকগুলি গবেষণার জন্য নির্বাচিত হতে পারে।

২. নাট্যকারদের সামগ্রিক সারস্বতকৃতিকেও গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা যায়। এখানে নির্বাচিত তিনজন কবি ছাড়া অনেক পণ্ডিত রয়েছেন যাঁদের সারস্বতকৃতি আজও অনেকাংশে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে সেই সমস্ত পণ্ডিতদের রচনাবলীর উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা যেতে পারে।

৩. পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের এমন অনেক নাটক রয়েছে যেগুলি আজও অপ্রকাশিত। বিবিধ বিষয়ের আশ্রয়ে রচিত নাটকগুলি নিয়ে গবেষণামূলক কাজ হতে পারে। নিত্যানন্দের এই নাট্যসম্ভারের সুবিস্তৃত তালিকা অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর '*শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ*' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। গবেষণাভিলাষী ব্যক্তি এই ঋদ্ধ গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন। আমিও আমার গবেষণার কাজে এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট ঋণী।

৪. এই অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলে বিরচিত *ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্* নাটকটি আলোচিত হয়েছে। নাটকটির নায়ক মহারাষ্ট্রের অন্যতম দেশপ্রেমিক বিনায়ক দামোদর সাভারকার। সাভারকারের জীবন ও দর্শনকে আশ্রয় করে কবি পলসুলে *বৈনায়কম্* নামক ২৫টি সর্গান্বিত একটি মহাকাব্য রচনা করেন। এই মহাকাব্যটিও গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে। অধ্যাপক সত্যব্রত শাস্ত্রী মহাকাব্যটির বিষয়ে বলেছেন-

"The Vaināyakakāvya is one of the finest of the poetic creations in Sanskrit, absorbingly interesting in its theme, exquisitely charming in

its poetic matrix and highly innovative in its artistic presentation. Dr. Palsule has added through it a yet another fragrant flower to the expanding grove of modern Sanskrit poetry for which he deserves full plaudits."[191]

পরিশেষে একথা বলতেই পারি আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্র অদ্যাবধি অনুন্মোচিত থেকে গেছে।এই অভিসন্দর্ভের মধ্যে দিয়ে সেই বিস্তৃত রচনাসম্ভারের একটি ক্ষুদ্র অংশকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। অন্তিমে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত কবি মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের উক্তিটি অবশ্য উল্লেখার্হ –

"নূতনগ্রহণে নাস্তি পরীক্ষাপেক্ষা, নূতনত্বমেব গ্রহণপ্রযোজকম্। পশ্য –

"নবং নারিকেলং নবীনঞ্চ চেলং

রমাঞ্চাপি নব্যাং গৃহং নূতনঞ্চ।

বচশ্চাপ্যপূর্বং বিশেষেণ সর্বে

রসজ্ঞাঃ পুরাণাচ্চিরায়াদ্রিয়ন্তে।।"[192]

অর্থাৎ সমস্ত রসজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্বদাই পুরাতনের থেকে নূতন নারিকেল, নূতন বস্ত্র, নববধূ, নূতন গৃহ এবং সর্বপরি নূতন বাক্-কে বিশেষভাবে সমাদর করেন।

---

[191] *বৈনায়কম্,* Foreword, পৃ. ১০

[192] *মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সারস্বত সাধনা,* পৃ. ২১৩

পরিশিষ্ট-ক

।। নিত্যানন্দের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি ।।*

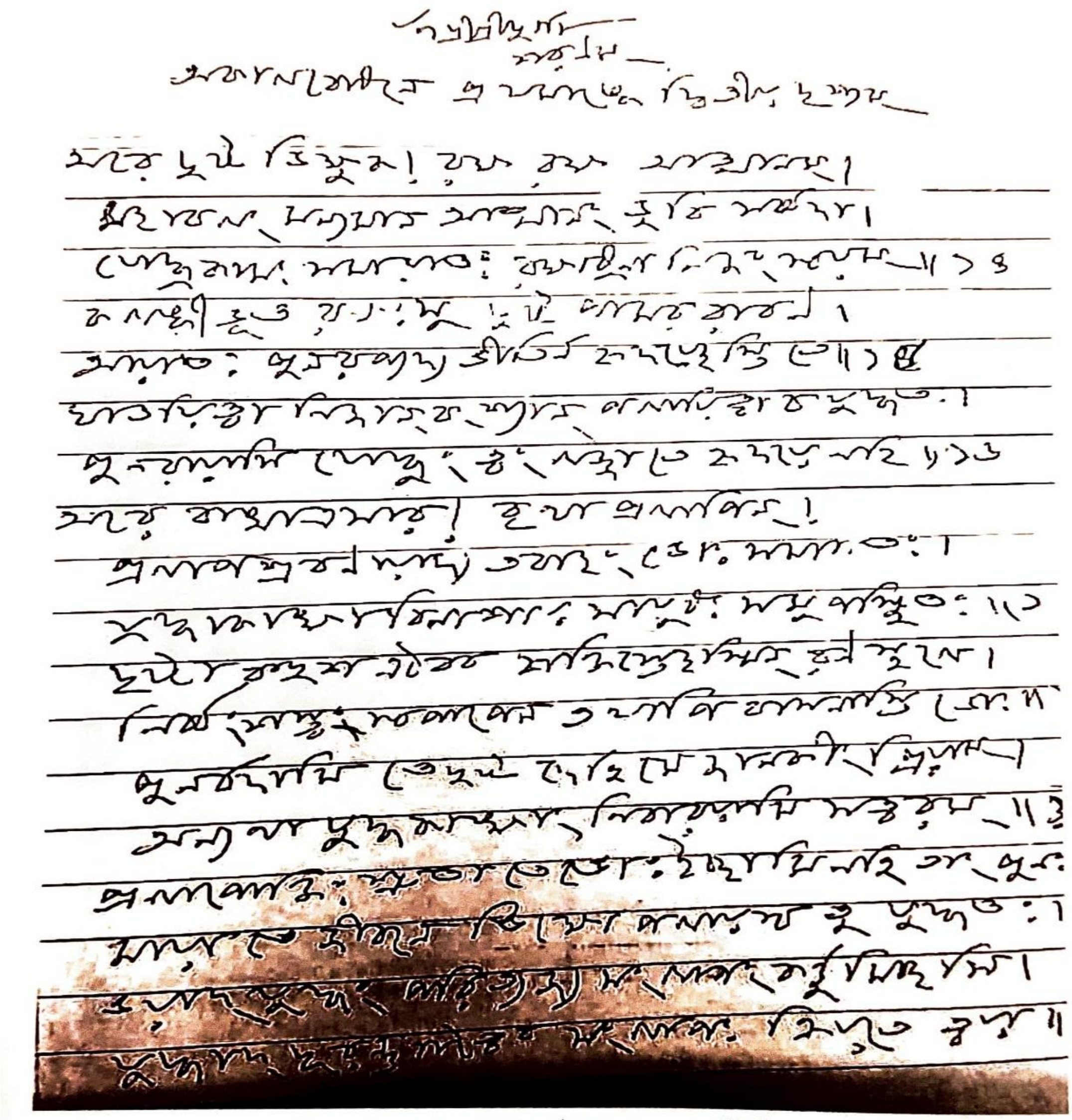

“অকালবোধনম্” নাটকের পান্ডুলিপি।

*এই প্রতিলিপিটি ঋতা চট্টোপাধ্যায় বিরচিত *শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ* গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি।

।। গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি ।।

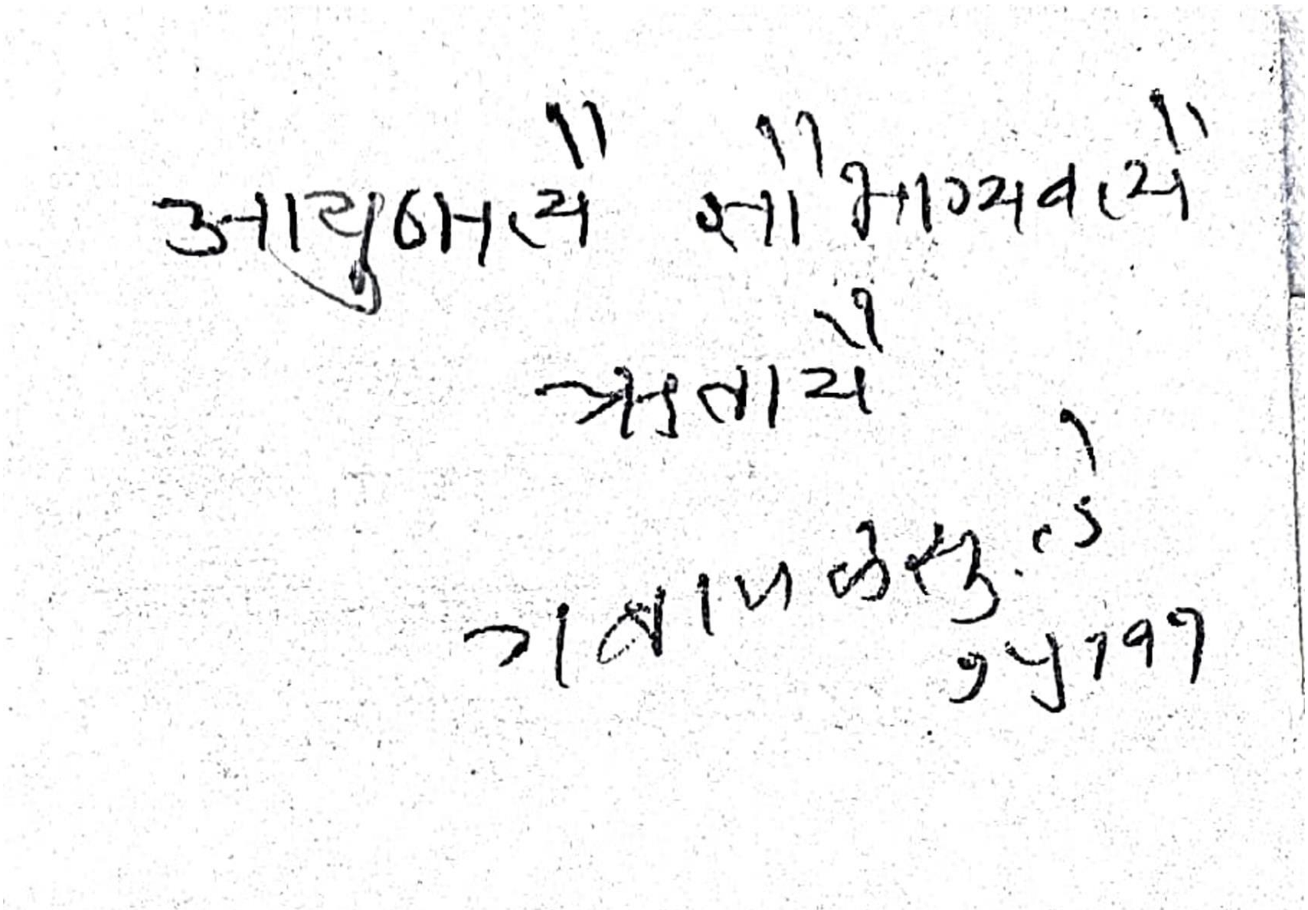

পরিশিষ্ট-খ

।। সীতানাথ আচার্যকৃত কবি নিত্যানন্দের প্রশস্তি।।*

নিত্যানন্দং ব্যপগতমলং যো জনেভ্যঃ প্রযচ্ছন্

নিত্যানন্দে নিজমপি মনো মজ্জয়ন্ যো ব্যরাজত্।

নিত্যানন্দো বিমলহৃদয়ো যঃ সদা নিত্যকৃত্যৈ-

র্নিত্যানন্দেঽমরভুবনকে সাম্প্রতং স প্রযাতঃ।। ১।।

শ্রৌতে স্মার্তে পথি সুকঠিনে লীলয়া সঞ্চরন্তং

তন্ত্রস্থানে সুখবিচরণং সাধনোদ্ভাসি বক্ত্রম্।

কাব্যোৎপাদে কবিকুলগুরুং শক্তিনৈপুণ্যরম্যং

নিত্যানন্দং বিরলবিবুধং শোকদীনাঃ স্মরামঃ।। ২।।

শাস্ত্রেঽসংখ্যে নিশিতনিশিতাং বুদ্ধিধারাং দধানং

বিদ্যাপীঠং নিখিলবিবুধৈঃ শ্রদ্ধয়ারাধ্যমানম্।

স্বান্তৈকান্তবিবহনপরং সংস্কৃতের্ভারতস্য

নিত্যানন্দং বিরলবিবুধং শোকদীনাঃ স্মরামঃ।। ৩।।

আকৌমারাৎ শয়নসময়ে জাগৃতৌ চাপি যস্য

* আচার্য, সীতানাথ। 'কবিঃ নিত্যানন্দঃ', *সমাজ ভারতী*(শ্রাবণ-আশ্বিন), ১৪১৬ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮-১৭।

দৈবী বাণী হৃদয়কমলে সন্নিষণ্ণা সদানাত্।

শাস্ত্রাচারানুসরণবিধৌ যস্য নিষ্ঠা বিশিষ্টা

নিত্যানন্দং তমতিসুজনং শোকদীনাঃ স্মরামঃ।।৪।।

।। ডা. দেবীপ্রসাদ খরবণ্ডীকরকৃত জি. বি. পলসুলের প্রশস্তি ।।*

শাস্ত্রৌঘমূর্ধ্নি বিলসৎ খলু শব্দশাস্ত্রং পাণিন্যুপক্রমুদাহৃতমদ্বিতীয়ম্।

তত্রাপ্যলৌকিকধিয়া বিহিতাবগাহং বন্দে গজাননগুরুং পরমাদরেণ।। ১।।

রাষ্ট্রাভিমানপরিপূরিতমুজ্জ্বলাভং স্বাতন্ত্র্যবীরচরিতং তব পূজনীয়ম্।

গ্রন্থান্ বহূংস্তদনুসৃত্য বিনিরিমিমাণং বন্দে গজাননগুরুং পরমাদরেণ।। ২।।

প্রজ্ঞাপ্রকর্ষরসিকত্বসহাধিবাসং গ্রন্থেষু ভিন্নবিষয়েষু নিদর্শয়ন্তম্।

বাগ্দেবতাসমুপলব্ধকৃপাপ্রসাদং বন্দে গজাননগুরুং পরমাদরেণ।। ৩।।

জানামি তে সুরগিরাপ্রণয়প্রকর্ষং তত্র ত্বয়া বিরচিতাঃ কৃতয়ঃ প্রভূতাঃ।

বাগীশ্বরীচরণপঙ্কজসক্তচিতং বন্দে গজাননগুরুং পরমাদরেণ।। ৪।।

শাস্ত্রং সুদুস্তরতমং ভবতু প্রকামং কামং তথা ভবতু কোমলকাব্যবন্ধঃ।

তত্রোভয়োঃ প্রকটিতপ্রতিভাবিলাসং বন্দে গজাননগুরুং পরমারেণ।।৫।।

প্রায়েণ বুদ্ধিবিভবো বিদুষাং স্বসংস্থো দৃষ্টঃ পরার্থমপি তে তু মতিপ্রকাশঃ।

ছাত্রোপকারকরণব্রতমাদধানং বন্দে গজাননগুরুং পরমাদরেণ।। ৬।।

শালীনতা মধুরতা মৃদুতা স্বভাবে ইত্যাদিভির্গুণগণৈর্ভুবনে দুরাপৈঃ।

আবর্জয়ন্তমিশং জনমানসানি বন্দে গজাননগুরুং পরমাদরেণ।। ৭।।

---

* খরবণ্ডীকর, দেবীপ্রসাদ। 'শ্রীগজাননাষ্টকম্', *সমর্পণম্* (পঞ্চম সংস্করণ), ২০১০, পৃ. ১৫৪।

পরিশিষ্ট-গ

।। বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি-১ ।।

[স্বনামধন্য লেখক, কবি, নাট্যকার ও ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকা*]

অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র	10, 25, 26, 69, 95, 121, 189, 205	ভরত (নাট্যশাস্ত্রকার)	15, 30, 122, 161, 168
অ্যারিস্টটল	18	মহাত্মা গান্ধী	38, 112, 129
ইন্দিরা গান্ধী	37, 39, 129, 135, 136, 139, 142, 143, 153, 189	ম্যাক্সমূলার	19
ইয়াহিয়া খান	129, 130	যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	72, 85
ঋতা চট্টোপাধ্যায়	19, 198	যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	13, 21, 22, 38, 189
চার্লস অগাস্টাস টেগার্ড	78, 88	রবীন্দ্রনাথ	8, 19
চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী	72, 87	রমা চৌধুরী	21, 22
কালিপদ তর্কাচার্য্য	27	রমেশচন্দ্র দত্ত	37
নীরেণ দাশগুপ্ত	72, 87	রাজশেখর	3, 209, 213
পঞ্চানন তর্করত্ন	53	রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী	10, 12, 15, 22, 23, 121
বাদল সরকার	14, 18	রাণাপ্রতাপ সিং	19
বামনাচার্য	31, 97, 171, 209	রামকৃষ্ণ	13, 19, 21, 22

* উক্ত লেখনশৈলীর জন্য ঋতা চট্টোপাধ্যায় বিরচিত *শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ* গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি।

বিবেকানন্দ 13, 19

বিধানচন্দ্র রায় 37, 57

বিশ্বনাথ কবিরাজ 13, 90, 95, 148, 161

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য 21, 25

বুদ্ধদেব বসু 26

ভট্টতৌত 123

লক্ষ্মীবাঈ 13, 19, 21, 38, 108, 189, 190

লীলা রাও দয়ালু 39

শিবাজী 19, 36, 37, 48, 83

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ 21, 25, 26, 27, 28, 38, 53

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 3, 9, 23, 24, 210

সীতানাথ আচার্য 202, 213

॥ বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি-২ ॥

[মৌলিক (কাব্য ও নাটক) এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থনামের তালিকা*]

অগ্নিপুরাণ 184

অথ কিম্ 14, 23, 24

অনাম্নী অঙ্গনা 26

অভিরাজযশোভূষণম্ 69, 95, 189, 190

অমরবীরবৃত্তান্তম্ 13, 58, 189

ইন্দিরাবিজয়ম্ 39

কটুবিপাকঃ 39

কলাপপ্রশস্তিঃ 27

গণেশপূজনম্ 23

তিলকায়নম্ 38

দরিদ্রদুর্দৈবম্ 28

দেশবন্ধুদেশপ্রিয়ম্ 21

ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্ 23

ননাবিতাড়নম্ 12, 15, 16, 23, 24

নিবেদিতনিবেদিতম্ 21

বিবেকানন্দচরিতম্ 43, 46

বিড়ম্বনা 26, 64, 65

বৈনায়কম্ 43, 44, 198

ভারতলক্ষ্মীনাটকম্ 13, 21, 38, 189

ভাসোঽহহাসঃ 43, 48

মশকধানী 22

মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত 37

মিবারপ্রতাপম্ 13, 15, 37

যুভাতঃ সংস্কৃতং প্রতি 39

রাজপুতজীবনসন্ধ্যা 37

রাষ্ট্রবন্ধুর্নাম 39

শিবাজীচরিতম্ 37

সমানমস্তু বো মনঃ 13, 43, 47

স্বর্গীয়হসনম্ 23, 24

স্বাতন্ত্র্যলক্ষ্মীনাটকম্ 38

* উক্ত লেখনশৈলীর জন্য ঋতা চট্টোপাধ্যায় বিরচিত *শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ* গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি।

প্ৰথম পাৰ্থ 26

প্ৰেক্ষণকসপ্তকম্ 12

বঙ্গকীৰ্তিবিধানম্ 21, 57

।। গ্রন্থপঞ্জি ।।

সংস্কৃত গ্রন্থ:

ক. আকর গ্রন্থ

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্ — শারদা গৌরব গ্রন্থমালা, পুণে, ১৯৭২।

বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ (নিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ-প্রণীতম্) — সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি।

বাংলাদেশোদয়ম্ (রামকৃষ্ণশর্ম-বিরচিতম্) — নাগ প্রকাশক, দিল্লী, ১৯৯৮ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)।

খ. প্রাচীন গ্রন্থ

ঔচিত্যবিচারচর্চা (ক্ষেমেন্দ্র বিরচিতা) — (সম্পা.) ব্রজমোহন ঝা,বারাণসী, ১৯৯২ চতুর্থসংস্করণ।

কাব্যপ্রকাশঃ (মম্মটপ্রণীতঃ) — (সম্পা.) ভট্টবামনাচার্যঝল্কিকর (*বালবোধিনী* টীকা সহিত), নির্ণয় সাগর প্রেস,মুম্বাই, ১৯০৯ (২য়সংস্করণ)।

কাব্যমীমাংসা (রাজশেখরকৃতা) — (সম্পা.) সি. ডি. দালালএবংআর. এ. শাস্ত্রী (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত), কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী শিরোমণি, ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট,বরোদা, ১৯৩৪ (৩য়সংস্করণ)।

কাব্যাদর্শঃ (দণ্ড্যাচার্যবিরচিতঃ) — প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত *মালিন্যপ্রোঞ্ছনী* টীকাযুক্ত, (সম্পা.) চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষত্, কলিকাতা, ১৯৯৫।

কাব্যালঙ্কারঃ (ভামহবিরচিতঃ) — (সম্পা.) রমণকুমার শর্মা,বিদ্যানিধি প্রকাশন, দিল্লী,২০০৮।

দশরূপকম্ (ধনঞ্জয়কৃতম্) — (সম্পা.) টি বেঙ্কটাচার্য, দি অড্যার লাইব্রেরী এণ্ড রিসার্চসেন্টার, অড্যার, মাদ্রাজ, ১৯৬৯।

ধ্বন্যালোকঃ (আনন্দবর্ধনবিরচিতঃ) — (সম্পা.) কে. কৃষ্ণমূর্তি, মোতিলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৮২ (২য় সংস্করণ)।

নাটকচন্দ্রিকা (রূপগোস্বামি-প্রণীতা) — (সম্পা.) প্রকাশ হিন্দীব্যাখ্যা সহিত, (সম্পা.) বাবুলাল শুক্ল, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬৪।

নাটকলক্ষণরত্নকোশঃ (সাগরনন্দিকৃতঃ) — (সম্পা.) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৪ (বঙ্গাব্দ)।

নাট্যশাস্ত্রম্ (ভরতমুনিকৃতম্) — (সম্পা.) আর. এস. নাগর, পরিমল পাবলিকেশন, দিল্লী, ২০০৩।

বক্রোক্তিজীবিতম্ (কুন্তকপ্রণীতম্) — স্বোপজ্ঞবৃত্তিসহিত, (সম্পা.) সুশীলকুমার দে, ফার্মা কে. এল., কলিকাতা (অধুনা কলকাতা), ১৯৬৯ (৩য় সংস্করণ)।

সাহিত্যদর্পণঃ (বিশ্বনাথকৃতঃ) — (সম্পা.) হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাসকৃত *কুসুমপ্রতিমা* টীকাযুক্ত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৫ (৫ম সংস্করণ)।

গ. অর্বাচীন গ্রন্থ

অভিনবকাব্যালঙ্কারসূত্রম্ (রাধাবল্লভ-ত্রিপাঠী-রচিতম্) — (স্বোপজ্ঞ কারিকা বৃত্তি সংবলিত), সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ২০০৫।

ইন্দিরাবিজয়ম্ (বেঙ্কটরত্ন-বিরচিতম্) — অম্বটিপূর্ণি বেঙ্কটরত্ন, এড়ু বাড়ু, ১৯৭০।

কাব্যকৌমুদী (হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ-কৃতা)	ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬২ (বঙ্গাব্দ)।
নাট্যত্রয়ী (রামকৃষ্ণশর্ম-প্রণীতা)	নাগ প্রকাশক, দিল্লী, ১৯৯৩,১ম সংস্করণ। শারদা গৌরব গ্রন্থমালা, পুণে, ১৯৯৮।
বৈনায়কম্ (জি. বি. পলসুলে-বিরচিতম্)	শারদা গৌরব গ্রন্থমালা, পুণে, ১৯৯৮।
শ্রীবিবেকানন্দচরিতম্ (জি. বি. পলসুলে বিরচিতম্)	শারদা গৌরব গ্রন্থমালা, পুণ্যপত্তনম্, ১৯৯৪ (৩য় সংস্করণ)।

ইংরেজী গ্রন্থসমূহ:

Chattopadhyay, Rita.	*20th Century Sanskrit Literature: A Glimpse into Tradition and Innovation*, Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 2008.
Chattopadhyay, Rita.	*Modern Sanskrit Dramas of Bengal: 20th Century A.D.*, Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 1992.
Dutta, Kali Kumar.	*Bengal's Contribution to Sanskrit Literature*, (Calcutta Sanskrit College Research Series No. CIII, Studies No. 66), Sanskrit College, 1974.
Gandhi, A. K.	*The life and times of Veer Savarkar*, Delhi, Prabhat Prakashan, 2016.

Ghosh, Manomohan — *The Natyasastra*, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1951.

John, Baxter & Patrick Atherton — *Aristotle's Poetics*, London, McGill-Queen's University Press montreal & Kingston, 1997.

Joshi, K. R. & S. M. Ayachit — *Post-Independence Sanskrit Literature*, Nagpur: Visvabharati Prakashan, 1990 (1st Ed.)

Keith, A. B. — *A History of Sanskrit Literature*, Delhi, Motilal Banarasidass, 2001.

Masterenhas, Anthony. — *The Rape of Bangladesh*, Delhi, Vikas Publication, 1971.

Mukherje, Prithwindra. — *BaghaJatin – The Revolutionary Legacy*, Mumbai, Indus Source, 2016.

Mukherje, Prithwindra. — *Baghajatin (Life and Times Of Jatindranath Mukherje)*, Delhi, National Book Trust, 2016.

Raghunathacharya, S. B. — *Modern Sanskrit Literature: Tradition & Innovation*, New Delhi, Sahitya Akademi, 2009, (Reprint).

বাংলা গ্রন্থসমূহ :

আজাদ, সালাম — *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, দিল্লী, ২০১০।

ইমাম, জাহানারা। *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশনী, বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

ঘোষ, অজিত কুমার। *নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ*, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯১।

চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ। *রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬০।

চক্রবর্তী, মনোজ। *সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে রসবাদ: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ,* কলকাতা, ২০০৯।

চক্রবর্তী, শ্যামাপদ *অলঙ্কারচন্দ্রিকা,* কলকাতা, কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী, ২০১৩।

চট্টোপাধয়ায়, ঋতা। *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০-২০১০) ছোটগল্প ও নাটক,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা, ২০১২।

---. *শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৮।

---. *সীতানাথ আচার্য: কবি ও প্রাবন্ধিক,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০২১।

---. *হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সারস্বত সাধনা,* সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ও সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩।

চট্টোপাধয়ায়, পরিমল। *সংস্কৃত নাট্যপ্রয়োগ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)।

দাশগুপ্ত, সুধীর কুমার। *কাব্যালোক,* দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৮।

দাস, করুণাসিন্ধু। *সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের রূপরেখা,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৮।

ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৭২।

ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপদ। *সাহিত্য মীমাংসা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬০।

ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপদ। *প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ভূমিকা,* কলকাতা,সংস্কৃত বুক্ ডিপো, ২০০৮।

মিত্র, সুধীরকুমার। *বাঘাযতীন,* শ্রীগুরু লাইব্রেরী,কলকাতা, ১৩৫৫ (বঙ্গাব্দ)।

মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলিকা। *সংস্কৃত কাব্যচর্চায় বাঙালী – সেকাল ও একাল,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩ (১ম সংস্করণ)।

মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীন্দ্রনাথ। *সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯২২।

মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন। *রসসমীক্ষা,* সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৮৪ (বঙ্গাব্দ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা,* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা, ২০০৬।

বিশ্বাস, সুখেন। *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।

সান্যাল, অবন্তীকুমার। *ভারতীয় কাব্যাতত্ত্ব,* সরস্বতী লাইব্রেরী কলকাতা, ১৯৯৫।

সাহা, অনিমা। *সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দোষতত্ত্ব,* সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৩।

হিন্দী গ্রন্থসমূহ :

ত্রিপাঠী, রাধাবল্লভ। *সংস্কৃত সাহিত্য – বিশবি শতাব্দী*, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯।

শর্মা, মঞ্জুলতা। *আধুনিক সংস্কৃত কাব্য কী পরিক্রমা*, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, নিউ দিল্লী, ২০১১।

গবেষণা পত্র/পত্রিকা :

আচার্য, সীতানাথ। *"কবিঃ নিত্যানন্দঃ"*, সমাজ ভারতী(শ্রাবণ-আশ্বিন), ১৪১৬ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮-১৭

খরবণ্ডিকর, দেবীপ্রসাদ। "*শ্রীগজাননাষ্টকম্*" সমর্পণম্ (পঞ্চম সংস্করণ), ২০১০, পৃ. ১৫৪